জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৭ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ১

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা কি করিতে হইবে (না)

আদিত্য নিগম, অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৭ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ১ ।। মাঘ ।। জানুয়ারি

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)'
Uponibesh Birodhi Chorcha - Ki Korite Hoibe (Na)
আদিত্য নিগম, অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

পুথির প্রচ্ছদ ছবি thisisnotawhitecube.com/exhibitions/8-discourses-of-decoloniality-group-show-not-a-museum/
প্রথম প্রচ্ছদ নিবন্ধের প্রচ্ছদ - গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কার্টুন *জাঁতাসুর*
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রচ্ছদ - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরব্য রজনী সিরিজ। ছবিতে খাদ্য পরিবেশন করছে এক ভারতীয় চরিত্র। ফরাসি আঁকিয়ের দ্বারকানাথের স্থির চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হতে পারে যেন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম কর্পোরেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজেই খানসামা সেজে বেলগাছিয়া ভিলার ভোজসভায় মিস ইডেনকে খাদ্য পরিবেশন করছেন।

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ রায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, সাজাহান আলি, বিশ্বেন্দু নন্দ

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ১০০ টাকা
কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

‘যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি’

গত ২২শে জানুয়ারি, ‘রাম’ হিন্দুত্ববাদের মুখোমুখি কলকাতার বুকে উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা সহ প্রায় ২০০টি সংগঠন ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী’ জুলুসে হাঁটলো। ‘রাম’ পাঁঠাদের বিরুদ্ধে বাংলার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে হকার-চাষী-ছাত্র-যুবদের সাথে পা মেলালেন দিনাজপুর থেকে খন নাচের অভিকর শিল্পীরা। তাদের মুখে ছিল পারম্পরিক মুখোশ। নাম গমিরা মুখা। এই কাঠ-মুখোশ একাধারে বাংলার কারিগরি জ্ঞানচর্চা ও সংশ্লেষী ধর্মচেতনার প্রতীক। বিজেপি-আরএসএস বিরোধী লড়াইয়ে সর্বাগ্রে এরাই থাকছেন। ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে ভদ্রবিত্ত বাঙালির বাম সেকুলার-মুখোশ, বেরিয়ে আসছে উগ্র-হিন্দুত্বের নখদাঁত। একটি বিশেষ ভোটবাজ বামদল (পড়ুন সিপিএম) এবং অতীতের বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু শক্তিশালী গণআন্দোলনের রাজনৈতিক বাম-শক্তি ইদানীং বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে সার্বিক গণতান্ত্রিক ঐক্যের পক্ষে দাঁড়াতে পিছপা হচ্ছেন। এবং, তাদের অনেক নেতা-কর্মীই এই দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপকে ট্রটস্কিপন্থীদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সার্বিক বাম ঐক্য তত্ত্বকে সামনে রাখছেন। ট্রটস্কির স্তালিনপন্থী বাম-ব্যুরোক্রেসি-বিরোধী তত্ত্বায়নের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই, এবং একজন

আগাপাশতলা স্তালিনপন্থী পার্টিকাঠামোর বিরোধী হিসেবেই তাই ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'দি রাশিয়ান রেভেলিউশন' গ্রন্থ থেকে খানিকটা অনূদিত অংশ এখানে রাখছি-

'ট্রটস্কির চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব ১৮৭৫ সালে মার্ক্স কর্তৃক প্রণীত শ্রেণিসম্পর্ক বিষয়ে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। লেনিন এবং বলশেভিকদের বিরোধিতা করে রুশ বিপ্লবের আগেও ট্রটস্কি যে তত্ত্বটি উত্থাপন করেছিলেন, তাতে কৃষকদের প্রতিবিপ্লবের পক্ষে সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অবশ্যই, ট্রটস্কি আধা-সর্বহারা ভূমিহীন কৃষকদেরকে তাদের শ্রেণীর উচ্চস্তরের কৃষকদের থেকে আলাদা করেছিলেন। কিন্তু, এটি একটি সমস্যাবহুল যান্ত্রিক পদ্ধতি। এটি একটি ভুল পদ্ধতি ছিল।.... এই আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবী তত্ত্ব এমন একটি দেশে বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যেখানে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে, কৃষকদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ গড়ে উঠতে পারে না।' (পৃষ্ঠা-২৯)

এও মনে রাখার যে, অগস্ট আন্দোলনের দ্যোদুল্যমান অবস্থানের জন্য আজও সেদিনের সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী রাজনীতির সমারোহ হওয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এক আনা অবদান না রাখা সঙ্ঘীরাও চিমটি কাটতে ছাড়েনা। বরং, ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের ভিতরে থাকা জয়প্রকাশ নারায়ণের মত সমাজতান্ত্রিকদের প্রতিষ্ঠা করা 'কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি' বুকে বল পেয়েছিল ১৯৩৬-এ কংগ্রেসে সদ্য জেলফেরত রায়ের আবির্ভাবে। সে সময়ে রায়ের স্লোগান ছিল- 'consolidate the leftist forces and radicalize the Congress organization'... জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে সর্দার প্যাটেলের মত দক্ষিণপন্থীরাও এই সময় কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং, আজকের দ্যোদুল্যমানতার জন্য ভবিষ্যতের কাছে, উত্তরপ্রজন্মের কাছে আবার আমাদের জবাবদিহি করতে না হলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, রায়ের বিচারই শিরোধার্য। যাই হোক, এই দুঃসময়েও

'আমাদের নানান পথে নানান মতে দলাদলি
কেউ বা চলি ডাইনে বা কেউ বাঁয়ে চলি'।

এই 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনে' উপস্থিত হয়েছিলেন, লেখক, অধ্যাপক, বিউপনিবেশায়নের তাত্ত্বিক আদিত্য নিগম। জ্ঞানগঞ্জ দলের সঙ্গে তার দীর্ঘ কথোপকথন ও সম্মেলনে ছাত্র-যুব সমাবেশে তার বক্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ হল। তার একাধিক বই চর্চাদলের অবশ্যপাঠ্য পাঠবস্তু হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে। তার 'ডিজায়ার নেমড ডেভেলপমেন্ট' গ্রন্থে যেভাবে তিনি দেখেছিলেন, তথাকথিত 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' কালখন্ডে নয়া উদারনৈতিক পুঁজি ও গোলকায়নের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ভদ্রবিত্তদের পণ্যপ্রিয়তাকে, বিশেষত অটোমোবাইল শিল্পের দাপাদাপি ও সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত ন্যানো-কারখানার পরিপ্রেক্ষিতে, তা চর্চাদলের উন্নয়ন-অর্থনীতি বিষয়ক পর্যবেক্ষণের তাত্ত্বিক পূর্বসূরি

বলা চলে।

তার ‘দ্য ইনসারেকশান অফ লিটল সেলফস: দ্য ক্রাইসিস অফ সেকুলার ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া’ বইটিও চর্চাদলের নিজস্ব আলাপচারিতার ‘সেকুলারিজম’ বিষয়ক অবধারণাগুলির কাছাকাছি কথা বলে। এই বইটিতে প্রায় একটি নিয়োজিত প্রকল্প হিসেবে আদিত্য ‘সেকুলার-জাতীয়বাদ’ কে বিশ্লেষণ করেন, এবং ইউরোপীয় আধুনিকতার দুই ‘মহৎ’ মতাদর্শিক-মৌল- ‘সেকুলারিটি’ এবং ‘জাতীয়বাদ’ তথা জাতিরাষ্ট্রের ঠিকুজি-কুলুজি রচনা করেন। এবং দেখান, কিভাবে এই মতাদর্শিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া, যা ভারতীয় সমাজের ‘ব্যক্তি’করণ ঘটায় ও যূথবদ্ধ কৌমগত চেতনাগুলি থেকে সরিয়ে আনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘বৃহৎ আমি’ থেকে ‘ক্ষুদ্র আমি’-র এই চলনকে, আদিত্য নিগম তুলে ধরেন ভারতরাষ্ট্রের সেক্যুলার নির্মিতির প্রেক্ষাপটে [আদিত্য নিগমের মন্তব্য, ‘আসলে এই বইতে আমার বক্তব্য এই যে - আমাদের মত দেশগুলোতে ‘ব্যক্তি’করণ কখনোই ‘পুরো’ হয় না - বরঞ্চ অন্যান্য ‘ক্ষুদ্র আমি’র - যেটাকে আমরা পরিচয়ের রাজনীতি বলে থাকি - তার আবির্ভাব/ বিস্ফোরণ ঘটে আধুনিকতার সংকটের মুখে’]।

তার অপর দুটি গ্রন্থ, যথাক্রমে ‘আফটার ইউটোপিয়া: মর্ডানিটি, সোশ্যালিজম অ্যান্ড দি পোস্টকলোনি’ এবং সদ্যপ্রকাশিত ‘বর্ডার মার্ক্সিজম অ্যান্ড হিস্ট্রোরিকাল মেটেরিয়ালিজম: আনটাইমলি এনকাউন্টারস’ বাঙালি ভদ্রবিত্ত-লালিত মার্ক্সীয় বলয়ে এখনও বিশেষ প্রচলিত পাঠবস্তু নয়। তার কারণ, সম্ভবত তিনি প্রচলিত মার্ক্সীয় আখ্যানের বাইরে বেরিয়ে কথা বলছেন। কথা বলছেন, পার্টি-কাঠামো বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রশ্নচিহ্নসম অবধারণাগুলির বিষয়ে। একদা সিপিআইএম দলের সক্রিয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক সুতোয় গাঁথছেন, নর্মদা, নন্দীগ্রাম আর নকশালবাড়ির আন্দোলনকে- এই প্রতিরোধ-মুহূর্তগুলিকে তিনি দেখেছেন উচ্চকিত আধুনিকতার মরণ-সংকট হিসেবে। প্রশ্ন করছেন, পুঁজি ও প্রগতির একরৈখিক ‘ইতিহাস’ রচনাকারী দ্বান্দ্বিকদের।

এহেন আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতায় চর্চাদল বিশেষ ঋদ্ধ হয়েছে। প্রতিষ্ঠান ও অ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী এই সংলাপে যে ‘শতফুল বিকশিত হোক’ ডাকে পুনরাবৃত্তি হল, তা দীর্ঘজীবী হোক।

ভবিষ্যতে বিজেপি-আরএসএস বিরোধী লড়াইয়ের পাথেয় হোক এই ধরণের বার্তালাপ।

ধন্যবাদান্তে,

অত্রি ভট্টাচার্য

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
কার্টুন জাঁতাসুর

জ্ঞানগঞ্জ আলাপ: পুঁথি ১

‘উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা কি করিতে হইবে(না)’

আলাপে আদিত্য নিগম ।। অত্রি ভট্টাচার্য ।। বিশ্বেন্দু নন্দ

আলাপ ধারণ সহায়তা সাজাহান আলি

অত্রি ভট্টাচার্য - আপনি তো অনেক দিন পর কলকাতা এলেন। এমন একটা সময়ে এলেন যখন দেশজুড়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়া নিয়ে যে পোলারাইজেশনের ফ্যাসিবাদী পরিবেশ পরিসর তৈরি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কলকাতায় একটা বেশ বড় মিছিল হয়েছে, তিনদিন ধরে কলকাতা ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলন হচ্ছে। শহরের এই পরিবেশটা আপনার কেমন লাগছে যদি বলেন।

আদিত্য নিগম - এবার কিন্তু আমি তফাতটা নিজের চোখে দেখছি, বিশেষ করে যে [ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনের] প্রোগ্রামটা গত ২-৩দিন ধরে চলছে, এবং সেই সম্মেলনে যে অনুষ্ঠানগুলো হয়েছে, তাতে মনে হল একটা মোটামুটি পুশব্যাকমত হয়েছে। এর আগে এসেছিলাম ২০১৬য়, তারপরে ২০১৯এ। ২০২১এ নির্বাচনের সময়ে এখানে না এলেও খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছিলাম যা যা ঘটছিল - সব। তখনও কিন্তু তাদের [সঙ্ঘ পরিবারে] একটা এগ্রেসিভ প্রেজেন্স দেখা যাচ্ছিল। আমার মনে হয় সিপিএমের ভূমিকায় সমস্যাটা বেড়েছে - ইলেকশনের সময় একটা অলিখিত জোটে ছিল তারা। আমার এক বন্ধু সে সময় বই লেখার কাজে কলকাতায় কয়েকবার এসেছিল। সিপিএমের সঙ্গে জুড়ে থাকা বহু লোকের সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। অধিকাংশ সমর্থক, ক্যাডারের চোখ ভিজে যাচ্ছে হরেকৃষ্ণ কোঙার, প্রমোদবাবু [দাসগুপ্ত], জ্যোতিবাবুর [বসু] কথা বলতে বলতে - কিন্তু মিনিটের মধ্যে পালটে গিয়ে বলছে মুসলমানদের এখানে পিঁপড়ের মত থাকতে হবে। এই ধরণের [রিগ্রেসিভ] কথা তারা অবলীলায় বলছিল। বন্ধু অবাক হয়ে দেখছে, বাম ক্যাডারদের একই সঙ্গে দুই বিপরীত ধরনের কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে না। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম এটাও বাস্তব। এটাও এমন একটা বাস্তব যেটা নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবি না। তবে এই ধরণের ফেনোমেনা কেন হয়েছে তার যৌক্তিকতা আমি অনেক আগেই শুনেছি একজন সিপিএমের নেতার মুখেই।

এবার কিন্তু মনে হচ্ছে কলকাতায় সঙ্ঘীদের প্রভাব তুলনামূলক কম। এর কিছুটা উত্তর ভারতের নির্বাচনের প্রভাবও হতে পারে। যদিও ইলেকশনের রেজাল্টে সব সময় ফলাফল বোঝা যায় না... এবার ওরা মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় নির্বাচনে জিতে গেলেও অনেকেই জানেন যে এই জেতাটা ঠিক জেতা নয়। তাই ওদের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ উত্তর ভারতে দেখা যায় নি। ওরা [বিজেপি] ইলেকশনটাকে রিগ করে নিয়েছে... শুধু ইভিএম রিগিংএর কথা ভাবলে হবে না... ইলেকশন কমিশনকে ওরা দখল করেছে... একটা রাজ্যে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে নির্বাচন চলে, ইভিএমগুলো [ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন] স্টং রুমে পড়ে থাকে - সেগুলো কে কে পাহারা দিচ্ছে আমরা জানি না। মধ্যপ্রদেশে একটা জায়গায় তো বিরোধীদের যে কর্মীরা স্টং রুমের বাইরে পাহারা দিচ্ছিলেন দেখেন হঠাৎ এলইডি স্ক্রিনটা বন্ধ হয়ে গেল - এক দেড় ঘন্টা - তারা জানেন না এই সময় ভেতরে কী ঘটেছিল... একমাস ধরে ইলেকশন হচ্ছে... ইভিএমগুলো স্ট্রং রুমে পড়ে আছে... কে পাহারা দিচ্ছে

না দিচ্ছে জানা নেই। কিন্তু আমি দিল্লির সাধারণ লোকজনের মধ্যে দেখছি, করোনার সময় যেমন তালি থালি-টালি ইত্যাদি পেটানো হচ্ছিল, সে রকম উৎসাহ কিন্তু এবারে চোখে পড়ে নি। সে সময়ে যে পাগলামি দেখেছিলাম, সেই উন্মাদনা এবার রামমন্দিরের [উদ্বোধনের] সময় ডেফিনিটলি চোখে পড়ে নি। ওরা মন্দিরে মন্দিরে [পুজারতি] অর্গানাইজ করেছে... সেই উদ্যম বাদ দিলে লোকেরা বাড়িতে পুজাপাঠ মনে হয় করে নি। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে...

অত্রি - তাহলে কী মনে করছেন একটা প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে?

বিশ্বেন্দু নন্দ - আপনি কী মনে করেন, যে পার্টি ৩০ বছর ক্ষমতায় ছিল তাদের যে ক্যাডার, তাদের যে সমর্থক - যেমন সিপিআই দল করা আমার বাবা-মা তিন বার পার্টি ভাঙা দেখেছেন, আমি দুবার দেখেছি, বাবা-মায়ের বাম-বন্ধুদের এক বিঘত থেকে দেখেছি, তাদের চরিত্র জানি। তো সেই সক্রিয় রাজনীতি করা মানুষজনের মধ্যে কেন ইসলামোফোবিয়া/মুসলমানফোবিয়া তৈরি হল? আপনার কী মনে হয়? কারন রাজনৈতিকভাবে বাম ক্যাডারদের এই

ধরণের ধর্মীয় বিদ্বেষ থাকার কথা নয়।

আদিত্য - না, থাকার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে আমি একটা অদ্ভুত, ইন্টারেস্টিং কথা বলব। ১৯৯৯ সালে আমি একটা থিসিস লিখছিলাম। সেই কাজে আমার কলকাতায় আসা। সেই থিসিসের একটা চ্যাপ্টার হল বেঙ্গলে কী ধরণের সেকুলারিজমের প্র্যাকটিস ছিল [তাই নিয়ে খোঁজ]...

বিশ্বেন্দু - আপনি তো সেকুলারিজম শব্দটাকে নতুন ভাবে দেখতে, ভাবতে বলছেন।

আদিত্য - আমার এখন মনে হয় সেকুলারিজম কথাটাই আমাদের দেশে খাটে না। ইওরোপের ইতিহাস থেকে এই কথাটা আমরা পেয়েছি। তারা হাজার খানেক বছর চার্চের অধীনে এক অন্ধকার যুগে ভুগেছেন। সেখানে চার্চ আর রাষ্ট্র একে অপরের সাথে গাঁথা ছিল। তাই এই দুটোকে আলাদা করার কথা বলা হয়। আমাদের ভূখণ্ডে সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের ইতিহাসের এই দুই সংগঠন কখনোই সেভাবে গাঁথা ছিল না। যাই হোক, সে সময়ে [থিসিসের কাজ চলাকালীন সময়ে] আমি বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, ইন্টারভিউও করেছি অনেক জায়গায়। সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি আমায় যে কথা বললেন, সেটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। অপারেশন শানসাইন-টানশাইনএর [১৯৯৬এর হকার উচ্ছেদ পরিকল্পনা]

সিপিএমের একমাত্র মাস লিডার সুভাষ চক্রবর্তী

১৯৯৬এর ২৪ নভেম্বরের হকার উচ্ছেদ প্রকল্প, অপারেশন সানসাইনের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল

সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ব্যাপার নিয়ে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সিপিএমের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে তিনিই বোধহয় একমাত্র মাস লিডার ছিলেন, বাকিরা সব অফিসে কাজ করা [আমলা টাইপের] নেতা। তিনি আমায় বললেন ‘দেখ ভাই, তুমি বামপন্থী চেতনার কথা ভাবছ। ঠিকই ভাবছ। কিন্তু সমস্যা হল সিপিএমের অধিকাংশ কমরেড কিন্তু বামপন্থী চেতনার [মানুষ] নয়। আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছিলাম একটা তুমুল এন্টিএস্টাবলিশমেন্ট আবেগে [ভর দিয়ে]। কিন্তু এই এন্টিএস্টাবলিশমেন্ট যখন রাইট উইংএর কাছে যায় তখন তারা অনেক বেশি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আমাদের তো সংবিধান দেখতে হয়, আমাদের নানা রকমের ইন্সটিটিউশন রক্ষা করার কথা ভাবতে হয়। ওদের এসব বাধ্যবাধকতা নেই - ওরা যেদিন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এন্টিএস্টাবলিশমেন্ট শক্তি হয়ে ফিরে আসবে, তখন কী ধরণের চেহারা নেবে [আমরা ভাবতেও পারি না], এবং এই সময়টা ১৯৯৯, তখন মমতা-টমতার রাজত্বের কথা কথা ভাবা যায় নি... এই নির্বাচনে বিজেপি প্রায় ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল এবং তাদের সৌভাগ্য সুভাষ চক্রবর্তীর কেন্দ্র দমদমে ওদের প্রার্থী জিতেছিল।

বিশ্বেন্দু - সে সময় সিপিএম প্রথম ভাঙার মুখে দাঁড়িয়ে। সফি সাহেব দলে নীতি পুনর্বিবেচনার ডাক দিচ্ছেন। বিপুল বিতর্ক চলছে সিপিএমের মধ্যে বামপন্থী পথ নিয়ে।

আদিত্য - হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি [সুভাষ চক্রবর্তী] কিন্তু সেদিন বলছিলেন, ওরা যেদিন এন্টিএস্টাবলিশমেন্ট অর্থাৎ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে, অনেক বেশি হিংস্র হবে, এদের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আর যেহেতু আমরা ওপর ওপর দেখে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে এটাই বামপন্থী চেতনা। ক্ষমতার প্রভাবে কনভার্ট হয়ে আছে, কারন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে, তাদের সঙ্গে ক্ষমতার অনেকগুলো ইকুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে। এই ইকুয়েশন ভাঙলে কী চেহারা দাঁড়াবে আমরা জানি না। এই কথাগুলো কিন্তু উনি সে সময় বলতে পেরেছিলেন।

বিশ্বেন্দু - সুভাষ চক্রবর্তী সত্যি সত্যি মাস লিডার ছিলেন। উনি হকার উচ্ছেদ করেছেন, আমরা মিছিলে মিছিলে তাঁর মুণ্ডুপাত করেছি, সেই মানুষটাই আবার হকারদের সম্মেলনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খুবই ইনক্লুসিভ মানুষ ছিলেন, পুরোনো কংগ্রেসি নেতাদের মত। তবে হকার ইউনিয়নকে সাহায্য করার উদ্যম পার্টির অন্দরে তার বিরোধী পক্ষকে মোকাবেলার রাজনীতিও বটে, এই তথ্যটাও বলে রাখা দরকার।

আদিত্য - এটা আমিও লক্ষ্য করেছি...

অত্রি - আমরা একটা প্রকল্পের কথা ভেবেছি, তার নাম ক্যাডার কয়েদি। প্রকল্পটা যে বামেদের প্রতি ক্রিটিক করে তৈরি হয়েছে এমন নয়, সামগ্রিকভাবে সংগঠনের ধারণা, সংগঠনের সঙ্গে ব্যক্তি ক্যাডারের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করছি। সংগঠনের অনেক কাজই ক্যাডার যখন মন থেকে মেনে নিতে পারে না, তখন সে শুরুতে তার মত করে সংগঠনকে কশান দেয় এবং শেষে প্রান্তে চলে যায়। সে যে সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী, পার্টি বিরুদ্ধে কথা বলছে এমন নয়, হয়ত সে মনে করছে সে সংগঠনের ভালর জন্যেই কথা বলছে - কিন্তু সে পার্টির নীতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে দলের কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়া থেকে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, আপনার কাজের [গবেষণা, বই লেখার] যে পরিসর রয়েছে, সেই পরিসর থেকে আপনি ব্যক্তি জীবনে সিপিএম দলের সদস্য থেকেছেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের মত ঘটনা ঘটার সময় রাষ্ট্রীয় বা দলীয়ভাবে ডেভেলাপমেন্টের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে তাকে বোঝারও চেষ্টা করছেন। আপনার লেখাও রয়েছে নকশালবাড়ি, নর্মদা, নন্দীগ্রাম, সেই প্রবন্ধেও আপনি বিকাশের রাজনীতিকে বুঝতে চেষ্টা করছেন। [একদা সিপিএম পার্টির সমর্থক হয়েও] আপনার এই ভাবনার ডিপার্চার কীভাবে হল?

মণ্ডল কমিশনের বিরুদ্ধে সবর্ণ যুবাদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বেন্দু-অত্রি - এখনও সিপিএম ক্যাডারেরা বিশ্বায়নের কথা বলেন, সেই উন্নয়নের ধারণাও তারা আঁকড়ে ধরে আছেন।

আদিত্য - আমি অবাক হয়ে যাই, এখনও সিপিএমের [পুরোনো পার্টি অবস্থানে] সিঙ্গুর ছাড়া কিছু বলার নেই, এখনও তারা শিল্পায়নের প্রচার করে...

বিশ্বেন্দু - এখনও সিপিএম নেতারা সিঙ্গুরে ন্যানো চড়ে প্রচারে যায়...

আদিত্য - [হাসি] না, এইটা আসলে আমি সিপিএম ছাড়ি যখন...

বিশ্বেন্দু - সেটা কোন সময়?

আদিত্য - আমি হোলটাইমারশিপ ছাড়লাম [১৯]৯০এ আর পার্টি ছাড়লাম [১৯]৯২এ। এই তিন-তিনটে বছর ভারতের রাজনীতিতে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে - প্রথম এন্টি-মণ্ডল এজিটেশন হল। দিল্লিতে থেকে আমি আপারকাস্ট... এই আন্দোলনকে কী আখ্যা দেব জানি না... হয়ত ফ্রেঞ্জিই বলব... সেটা যে দেখব ভাবতেই পারি নি। এই ব্যাপারটা দেখে আমার মনে হল যে আমাদের [অর্থাৎ বামেদের] এই বিষয়ে কোনও আলাদা বক্তব্য নেই। বামপন্থীরা এখন স্পেক্টেটর হয়ে গেছে।

আমার তখন একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার কথা মনে পড়ছিল, এই ঘটনার ১০ বছর আগের। আমি তখন ছাত্র, এসএফআই করছি, সেন্ট্রাল কমিটতেও ছিলাম। বাসবপুন্নাইয়া মিটিং নিচ্ছিলেন - কেরালার এক নেতা, সি পি জন ১৯৮৬তে সিপিএম ছেড়ে এম ভি রাঘবনের সঙ্গে মিলে তৈরি করেছিল

সি পি জন কাস্ট কোশ্চান ভারতের অন্য অঞ্চলের বিশেষ করে বাংলা থেকে আসা কমরেডদের তুলনায় যথেষ্ট ভাল বোঝেন

সিএমপি (কমিউনিস্ট মার্ক্সিস্ট পার্টি)। ৮০-৮১র দিকে সেন্ট্রাল কমিটিতে দাঁড়িয়ে সি পি জন জানতে চাইছেন, আমাদের দলের মণ্ডল কমিশন নিয়ে কোনও কিছু কী বলার আছে? সে কেরল থেকে আসা কমরেড, কাস্ট কোশ্চান সে ভারতের অন্য অঞ্চলের বিশেষ করে বাংলা থেকে আসা কমরেডদের তুলনায় যথেষ্ট ভাল বোঝে। বাসবপুন্নাইয়ার কাছে এর সোজা উত্তর জানা নেই। তিনি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। জন বলছেন, এখনও আপনারা কোনও স্ট্যান্ড নিতে পারেন নি, কবে মণ্ডল কমিশন নিয়ে স্ট্যান্ড নেবেন? তখন কিন্তু মণ্ডল কমিশন নিয়ে লোকজন আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। বিশেষ করে যাদের এটা প্রয়োজন, যাদের এটা লড়াই, তারা এটা নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছে। কিন্তু বাম নেতারা একে ঠাণ্ডা বস্তায় রেখে দিয়েছে। কিন্তু আমি একটা কথা পরিষ্কারভাবে বুঝলাম, তলার দিকে মণ্ডল কমিশন নিয়ে আলোচনা করার আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্রও কমে নি। জন কিন্তু এগ্রেসিভলি লড়ে গেল এই স্ট্যান্ড নিয়ে বাসবপুন্নাইয়ার সঙ্গে। জন

যখন এই বিষয়টা নিয়ে গলা তুলছে, যে বিষয়টা বিশদে নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে, তখনও কিন্তু আমরা ভাবিনি কাস্টের প্রশ্ন এতটা বড় হয়ে উঠবে। তখন আমরা কাস্ট কোশ্চেনের বদলে পেজেন্ট ইউনিটি ভাবছি, কিন্তু পেজেন্ট ইউনিটি যেভাবে কাস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে [তাকে এড়িয়ে যাচ্ছি, বা বুঝতে পারছিই না]।

সিপিআইএমএলএর সঙ্গে জুড়ে থাকা এক ভদ্রলোক [পার্থসারথি পাঠক] ২০ বছর আগে পিএইচডি করেছিলেন 'কমিউনিস্টস এন্ড কাস্টস' নিয়ে, হয়ত এখন সেই বইটা বেরোবে। পিডিএফটা আমার কাছে ২০ বছর আগে এসেছিল। সেটা পড়েছিলাম। সেখানে বিহারে বিশেষ করে বিনোদ মিশ্রের সময়ে লিবারেশনের কাজকর্মের কিছু তথ্য পেয়েছিলাম। এই যে আমরা ভাবি কাস্ট হায়ারারকি ভাঙতে গেলে ইকনমিক ইস্যুগুলোকে সামনে আনতে হবে, এটা করতে গেলে কিন্তু কাস্ট ওয়ার বাড়ছে। তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের অভিজ্ঞতা হল, যে মুহূর্তে আমরা ইকনমিক ইস্যুগুলোকে এড্রেস করছি, সে মুহূর্তে ছোট কৃষক স্থানীয় কুড়মি বা যাদব সমাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারন তারা বিষয়টা কেবল মার্ক্সবাদের তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখছিলেন না, বরঞ্চ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই লিবারেশন বিষয়টাকে অর্থনৈতিক শ্রেণী বনাম জাতি হিসেবে দেখেই ইতি টানছিল না, বরঞ্চ ছোট ছোট কুড়মি যাদব কৃষককে নিউট্রালাইজ করার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ এপিল নিয়ে তাদের মধ্যে যাচ্ছিল। কাস্ট নিয়ে বামপন্থীদের এওয়ারনেস মণ্ডল কমিশনের আগে ছিল বলে মনে হয় না।

বিশ্বেন্দু - পশ্চিমবাংলা বা সিপিএমে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনাই হয় নি...

আদিত্য - পশ্চিমবঙ্গের এসেম্বলি থেকে রিপোর্ট ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক সেই তিনটে বছর আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। [আদিত্যর কথার মধ্যে বিশ্বেন্দু মন্তব্য করল জ্যোতিবাবু বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে কাস্ট-ফাস্ট কিছু নেই] ঠিক। সেই তিনটে বছরে সব তোলপাড় হয়ে গেল। তারপর সোভিয়েতের পতন হল, তার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯১তে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট এল। স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টের সময় দেখলাম, আমাদের বামপন্থী সরকারগুলো, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার হতভম্ব হয়ে গেছে। এদের কাছে আর কোনও বিরুদ্ধ তর্ক নেই। হঠাৎ মনে হচ্ছে বামপন্থীরাও বেশ বদলে নিওলিবারেল হয়েগেছে। আইএমএফএর

লোন নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, লোন নেওয়া হচ্ছে...আর বামেরাও তাতে যোগ দিচ্ছেন

বিশ্বেন্দু - অথচ এক দশক আগে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে স্ট্যান্ড নেওয়া হয়েছে...

আদিত্য - হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু এই সময়ের [১৯৯১] পর থেকে সব কিছুই পালটে যাচ্ছে। সব দলেরই নিওলিবারেলিজমের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার ঝোঁকটা তৈরি হয়। পলিটিক্স-টলিটক্স সব চুলোয় গেছে; শুধু মনে হচ্ছে সরকার আছে, সরকার [নিওলিবারেল নীতিতে] চালাও, আর কোনও রকমে চোখের মণি করে ক্ষমতায় টিকে থাকো।

তৃতীয় [ধাক্কাটা] হচ্ছে বাবরি মসজিদ [ভাঙা], ১৯৯২। কাস্ট আর মণ্ডল [কমিশনের] সঙ্গে বাবরি [মসজিদ ইস্যুর] একটা যোগ ছিল। মণ্ডল কমিশনের আন্দোলন শুরু হওয়ার পরেই নতুন করে পাল্টা আক্রমন হিসেবে বাবরি মসজিদের ইস্যুকে তুলে আনা হল। তার আগের সময়ে বাবরি ইস্যু ছিল - তার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। তখনও হিন্দুত্ব, হিন্দু সমাজের জাতিভেদটাকে দিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে শত্রু খুঁজে হিন্দু ঐক্যের চেষ্টা করছিল। আর এই সময়েও তারই পুনরাবৃত্তি হয় - জাতির প্রসঙ্গকে ধামাচাপা দেবার জন্যে বাবরি মসজিদ ইস্যুকে আনা হল।

এই তিন বছরে দেখলাম এসবের একটাও বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। আমরা শুধুই গেস্ট আর্টিস্ট, স্পেকটেটর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভুল বললাম গেস্ট আর্টিস্টও নয়, আমরা শুধুই অডিয়েন্স হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাক্রম দেখেচলেছিমাত্র। ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে আমরা শুধুই দেখছি, দেখছি আর দেখছি। জ্যোতি বসু বলছেন বাবরি মসজিদের ইস্যুকে আদালত ঠিক করবে। আরে এটা পলিটিক্যাল ইস্যু। আদালত কি ঠিক করবে? এখন তো আমরা দেখেই নিয়েছি আদালত কী ঠিক করে।

বিশ্বেন্দু - আদালত তো এখন পার্টি হয়ে গেছে...

আদিত্য - [হাসি] এই বিষয়গুলো নিয়ে তলায় গিয়ে লড়ার দরকার ছিল, সেটা...

বিশ্বেন্দু - বুঝতে পারেন নি...

আদিত্য - না, তলার [গ্রাসরুট] সঙ্গে এদের সম্পর্কই ছিল না।

বিশ্বেন্দু - নেতারা তো গ্রাসরুটের বিষয়গুলো, আলাপগুলো, তাদের ক্যাডারদের মানসিকতা কিছুই বুঝতেই পারছেন না, রিলেটও করতে পারছেন না। তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা, ৭০ বছর ধরে যে পার্টি কাঠামো আর তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, তাকে কী নতুন করে প্রশ্ন করা দরকার হয়ে পড়ে না?

আদিত্য - হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় নিশ্চই দরকার ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে বলি, বাংলা আর কেরলের মধ্যে রাজনীতির একটা গুরুতর পার্থক্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ [বাম] নেতা এসেছেন টেররিস্ট আন্দোলন থেকে। তাদের মধ্যে একটা হিন্দুয়ানির রেশ চিরকালই ছিল। ভূপেনবাবু বা বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার লেখক... কী নাম যেন...

অত্রি - হেমচন্দ্র কানুনগো...

হেমচন্দ্র কানুনগো

আদিত্য - হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা এ সব বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন, ওই সময়কার বহু বাম বিপ্লবী কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এরা অনেকেই কিন্তু আসছেন মানসিকভাবে হিন্দু অবস্থান থেকে।

বিশ্বেন্দু - টেররিস্ট আন্দোলনে পুজো, গীতায় হাত রেখে শপথ ইত্যাদি...

আদিত্য - হিন্দু বলতে কিন্তু অধিকাংশ উচ্চবর্ণ। তাই তারা কোনও দিনই কাস্ট ইস্যুটা বোঝেন নি, যে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টা কেরলে ঘটতে পারল। কেরলে কমিউনিস্ট পার্টি

তৈরি হয়েছে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি থেকে। টেররিজম-ফেররিজম ইত্যাদির পর্বটা আসেই নি সেখানে। তাই তাদের রাজনীতিতে এই সিক্রেটিভ [গোপন] স্ট্রাকচারটার অস্তিত্ব ছিল না। চিরকালই একটা ওপেন স্ট্রাকচার ছিল। কেরলে ওপেন স্ট্রাকচারটা থাকার দরুন ওরা কিন্তু সমাজে কী চলছে, সে বিষয়টা জানত, বুঝত, আলোচনা করত। হাইলি ইডিওলজিক্যাল ছোট্ট দল ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করবে এই ভাবনাটা বাংলায় যে রূপ নিয়েছে, কেরলে সেই রূপ নেয় নি। কেরলে দিলীপ মেননের কাজ আছে [কাস্ট ন্যাশনালিজম এন্ড কমিউনিজম ইন সাউথ ইন্ডিয়া, মালাবার ১৯০০-১৯৪৮], নাইনটিজে (১৯৯৪) বেরিয়েছিল; দিলীপ দেখাচ্ছেন কীভাবে কেরলে লোয়ার কাস্টদের মধ্যে কমিউনিস্টদের বেসটা সহজে তৈরি হয়ে গেল, কারন এখানে কমিউনিজম কাস্ট ইকুয়ালিটির প্রশ্ন তোলে, ফলে খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মানসিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে। যার জন্যে সি পি জন [মণ্ডল কমিশন নিয়ে] প্রশ্নটা করতে পারল, সে প্রশ্ন অন্য কারোর মাথায় তখনও ঢোকেনি। তার একটাই প্রশ্ন ছিল, সমাজের সঙ্গে আমাদের দলের কী আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে? কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, ভ্যানগার্ডিজম সোজা ওখান থেকে - টেররিস্ট আন্দোলন থেকে চলে আসছে - জনগণের সঙ্গে শুধু ওয়ানওয়ে ট্রাফিক - কথাবার্তা নেই, আমরা নেতারা [সমাজে] যাব এবং বোঝাব। [হেসে] জনগণ আর তোমার কথা বুঝতে চায় না। এই জিনিসটা কিন্তু কেরলে হয় না, যার জন্যে তারা [কমিউনিস্টরা] ক্ষমতায় আসে যায়, ওরা একচেটিয়া ক্ষমতায় থাকে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বামেরা একটা ডেমোক্রাটিক স্ট্রাকচারে কাজ করে চলেছে আজও। লংটার্মে এই কাঠামোর কী পরিবর্তন আসবে জানি না। ক্ষমতা দখল করেও যেখানে বিপ্লব হয়েছে, রাশিয়ায়, চিনে, ভিয়েতনামে সেখানেও এখন ঘোরতর পুঁজিবাদ রাজ করছে। তাই বিপ্লব করে [সমাজ পরিবর্তন] হবে, না কী বিপ্লব না করে [সমাজ পরিবর্তন] হবে, এখন সেই প্রশ্নটা আরও ওপেন হয়ে গেছে।

বিশ্বেন্দু - এইভাবে [বাংলার কমিউনিস্টদের মত] ভাবলে হবে না ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার অর্থ হল বিপ্লব প্রচেষ্টার অপমৃত্যু।

আদিত্য - হ্যাঁ।

বিশ্বেন্দু - আমাদের এই পর্বে আপনাকে একটা প্রশ্ন আছে। আপনাকে [সুবোধ

মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনের মাঠে জ্ঞানগঞ্জ আর উপনিবেশ বিরোধী কর্পোরেট বিরোধী চর্চার পক্ষ থেকে] একটা বই দিয়েছিলাম যার নাম 'টড়ের তরবারি'। আমাদের গবেষণা দলের প্রথম মাসিক বই। আমরা সেই বইতে বলার চেষ্টা করেছি, বাংলায় পীরেরা আসছেন, লড়াই হচ্ছে, আবার কয়েকশ বছর পর যৌথ সংশ্লেষী কাজ হচ্ছে, সত্যপির বা বনবিবির মত যৌথ উপাস্য দেবতা তৈরি হচ্ছেন, বৈষ্ণবরাও সেই সংশ্লেষী কাজে জুড়ে যাচ্ছেন। কালকেতু গুজরাট শহর তৈরি করছেন, সেখানে ২২ হাজার মুসলমানকে আনিয়ে বসতি করাচ্ছেন।

আদিত্য - এই বিষয়ে তথ্য কোথায় পাব?

অত্রি, বিশ্বেন্দু - চণ্ডীমঙ্গলে...

বিশ্বেন্দু - এই সময় মুসলমান সমাজের কাঠামো স্পষ্টভাবে মঙ্গলকাব্যগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। উপনিবেশপূর্ব সময়ের বাংলার সামাজিক কাঠামোটা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য যেমন চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল কাব্যে পাচ্ছি। কালকেতুর সংশ্লেষী উদ্যমের প্যারালালি নবদ্বীপে গোস্বামী ভায়েরা [৫০০ বছর আগে অভদ্রবিত্ত কালকেতু দেবীর বরে রাষ্ট্র গড়িয়ে মুসলমান এবং অন্যান্য কারিগর সমাজের বসতি তৈরি করছেন, কাজ দিচ্ছেন। তারই কাছাকাছি সময়ে ১৫১৩য় আলাউদ্দিন হুসেন শাহের দবীর খাস বা সুলতানের একান্ত সচিব সনাতন গোস্বামী আর অর্থ মন্ত্রী সাকর মল্লিক রূপ গোস্বামী সুলতানের অধীনে চাকরি করার খেদ প্রকাশ করে চৈতন্যকে রামকেলিতে বলছেন - নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।/তোমার আগেতে প্রভু কহিতে করি লাজ॥ / পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার। /আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥ / আপন অযোগ্যতা দেখি মনে পাই ক্ষোভ॥ / অথবা, ...ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম।/ গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।।]

যারা সরকারি থাকবন্দীতে ২ এবং ৩ নম্বর আমলা, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁদের আগে আছেন একমাত্র সুলতান, তারা শ্রীচৈতন্যকে বলছেন আমরা মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করে মরমে মরে আছি। তুমি আমাদের উদ্ধার কর। আমরা কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বৃন্দাবন। তারা বাংলা ছাড়লেন। অর্থাৎ গোস্বামী ভায়েদের উদাহরণে দেখলাম ভদ্রলোকেরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তৈরি হওয়ার চার শতক আগেই লিখিতভাবে ইসলামবিদ্বেষী; উল্টো দিকে

কালকেতুর মত ছোটলোকেরা সংশ্লেষী জীবনযাপন করছেন।

এবং 'ভদ্র' শব্দটা যে উপনিবেশ পূর্ব সময়ে গালি হিসেবে গ্রামীন বৌদ্ধিকেরা ব্যবহার করতেন, তার উদাহরণ আমরা দেখছি উপনিবেশের এক্কেবারের প্রথম পর্বে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের যুগে ১৭৭০এর দশকে। কবি রতিরাম দাসের জাগ গানে ভদ্রলোক জমিদার অর্থাৎ ইংরেজপন্থীদের গালি দেওয়ার উদাহরণ পাচ্ছি। 'ভদ্র'বিত্ত বা 'ভদ্র'লোক পুঁটুলি শব্দটা ইংরেজিআনা বা উপনিবেশের তৈরি হয়ত, কিন্তু তার সাম্রাজ্য অনুগামী চরিত্র নবজাগরণের বহু আগে থেকেই আমজনতার জানা। শাসক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ওয়ারেন হেস্টিংস, দেবী সিংহকে রাজস্ব আদায় করতে পাঠিয়েছে রংপুর অঞ্চলে। এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে রাজস্ব আদায় করছে দেবী সিংহের রাজপুত লেঠেল। কর্পোরেট-রাষ্ট্রের সন্ত্রাস রুখতে দেবী জয়দুর্গা চৌধুরানী কড়া ভাষায় জমিদারদের জোটবদ্ধ হতে বৈঠক ডাক দিলেন। জমিদারদের মধ্যে কয়েকজন উপনিবেশপন্থী বৈঠকে মজা দেখতে এল। রতিরাম দাস জাগ গানে বলছেন, চারি ভিতি হাতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা/ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবার মজা।'

আমাদের প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাথায় থাকা এবং সামাজিক সম্মানওয়ালা চাকরি করে ভদ্রবিত্ত অমুসলমানদের ইসলামবিদ্বেষই বা কেন হল এবং ব্রিটিশদের দেশের সম্পদ লুঠের সময়ে সেই ভদ্ররা কোলাবরেটর হয়ে সরকারি থাকবন্দীর মাথায় থাকাতো দূরস্থান, মাঝারি গোছের চাকরি, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হচ্ছে, সুলতানি আমলে উচ্চপদ পেয়ে মুসলমান বিদ্বেষী হচ্ছে, কিন্তু উপনিবেশে তুলনামূলক নিচুপদ পেয়েও ইংরেজদের পদলেহী হতে বাধছে না, এই পার্থক্যটা কেন হল? চৈতন্য যখন আবির্ভূত হচ্ছেন, তার ৪ শতক আগে কাঁধে ক্রুশ, হাতে তরোয়াল আর মুখে ইসলাম-সেমিটিক বিদ্বেষ নিয়ে পশ্চিম ইওরোপিয়রা এশিয়ার আরবভূমি জয় করতে আসছে। ১৪৫০এর দশকে ইওরোপিয় শক্তি, এশিয়া-ইওরোপের মধ্যে বসফরাস প্রণালীর তীরে সীমান্ত বাণিজ্য শহর কন্সট্যান্টিনোপল, আজকের ইস্তাম্বুলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে এশিয়দের কাছে। আমাদের স্পেসিফিক জিজ্ঞাসা কোন পথে চতুর্দশ শতকে বাংলার ভদ্রবিত্ত সমাজে মুসলমান বিদ্বেষ প্রবেশ করল। এই ইসলাম/মুসলমানবিদ্বেষে ক্রুসেডের অবদান কতটা? দেবোত্তম চক্রবর্তী সূত্রে বলি 'মঙ্গলকাব্যে গোস্বামী ভায়েদের বক্তব্যে শ্রীচৈতন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখালেও, তিনি অনুগামীদের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদ করছেন না। বিমানবিহারী মজুমদার, 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' বইতে চৈতন্য-

নবদ্বীপের রাস্তায় শ্রীচৈতন্যের কীর্তন মিছিল। এই আন্দোলন প্রথম থেকেই সবর্ণ কব্জায় ছিল

আন্দোলনের প্রথম পর্বে হিন্দু ভক্তদের যে জাতিগত পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তাতে দেখি ব্রাহ্মণ ২৩৯, কায়স্থ ২৯, বৈদ্য ৩৭, সুবর্ণবণিক ১। অর্থাৎ এই আন্দোলন প্রথম থেকেই সবর্ণ কব্জায় ছিল। চৈতন্য নিজেও গোঁড়া স্মার্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। এর পাশাপাশি মল্লরাজা বীর হাম্বির, পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা রায় রামানন্দ, প্রভূত বিত্তশালী উদ্ধারণ দত্ত, জমিদারপুত্র কৃষ্ণদাস প্রমুখ চৈতন্য-আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর থেকেই নেতৃত্বে ছিলেন। হিরণ্যদাস ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজা, অদ্বৈত আচার্যের পূর্বপুরুষ রাজা গণেশের মন্ত্রণাদাতা, জীব গোস্বামীর পূর্বপুরুষ কর্ণাটকের রাজা। তবে এই উচ্চবিত্ত মানুষদের সবাই চৈতন্য সমসাময়িক নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির ব্যাপারটা মূলত তাঁদেরই কুক্ষিগত ছিল, চৈতন্যপ্রেমী আমজনতা সেই ক্ষমতা থাকবন্দীতে ভাগ বসাতে পারেন নি। যেভাবে বিবেকানন্দের বিদেশি ভক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের আর্থিক ও বৌদ্ধিক ব্যাপারটা সামলেছিলেন এবং তাঁর গুরুভাইয়েরা যেমন একটেরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, চৈতন্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেইরকমই ঘটেছিল।'

আগেই বলেছি পতিতোদ্ধার বাগাড়ম্বর। কেন বলছি এ কথা? চৈতন্যপন্থীদের সমাজের তথাকথিত প্রান্তিকদের বৈষ্ণবপন্থে ঠাঁই দেওয়া আসলে সমাজের অভদ্রদের মায়োপিক দৃষ্টিতে দেখা। উপনিবেশের আগের যুগে কারিগরেরা

স্থানীয় এবং বিশ্ববাজারের জন্যে উৎপাদন করত; পঞ্চায়েত, ষোলোআনা, বাইশা ইত্যাদি সামাজিক সংগঠন তৈরি করে সংঘবদ্ধও ছিল। গ্রামের কারিগর হকার কেন চৈতন্যের মধ্যবিত্ত সুলভ সমাজসুধারের ডাকে সাড়া দেবে? [লোকেশ্বর বসু, 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' বইতে বলছেন, ব্রিটিশ আমলের আগে, অর্থাৎ ছাপাখানা আসার আগের সময়ে শহরের বাইরের ভদ্রবিত্ত বলতে আমরা বুঝতাম ব্যবসায়ী-চাষী কারিগর পদবীওয়ালা পরিবার এবং আজকে যারা ভদ্রবিত্ত নামে পরিচিত তাদের অনেকেই সে সময়ে ভদ্রবিত্ত ফোল্ডে ছিল না। ১৭৫৭র পরে এই সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা ক্রমশ পাল্টায়। ১৭৮০র দশকে উইলিয়াম জোনস ইত্যাদিরা সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে কাবাবদের বিশেষ করে কায়েত, বদ্যি, বামুনদের পুনর্বাসন দিতে শুরু করে। ১৮৩০এর অর্থনৈতিক ধ্বস, ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামে, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস যাকে সিপাহি বিদ্রোহ, খুব বেশি হলে যুদ্ধ বলেন, পুরোনো সামাজিক কাঠামো ধ্বসে যায়, ১৮০ ডিগ্রি উল্টো সামাজিক থাকবন্দীর বিকাশ হয়, মেকলিয় প্রগতিশীল নিরিশ্বরবাদী হিন্দুত্ববাদীরা তার আগে থেকেই পড়াশোনায়, চাকরি, দালালি ইত্যাদিতে মহিলা, মুসলমান, কারিগর, চাষী সমাজকে পার্জ করতে শুরু করে হিন্দুত্ববাদী ব্রিটিশ উপনিবেশের সহায়তায়। যে জন্যে যারা মহিলাদ্বেষী, মুসলমানদ্বেষী, ছোটলোকদ্বেষী, উপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রের চোখ আর বাস্তবতা দিয়ে উপনিবেশের আগের সময় দেখতে চান তাদের সামাজিক বিশ্লেষণ, সাহিত্য, তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে, আমরা হকার কারিগর চাষীর রাজনীতি করা দল স্রেফ করুণা করি। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'শাহজাদা দারাশুকো', বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব ক'টা উপনিবেশিক সময়ে বসে উপনিবেশের তত্ত্বে, তার আগের সময়কে দেখা মার্কা ইতিহাস স্রেফ বর্জন করেছি] সে তো রোজগার করে, বিশ্বজুড়ে ব্যবসা করে। শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনে যারা উদ্ধার হচ্ছেন তারা আজকের ভাষায় 'আরবান পুওর'। গ্রামের কারিগর ১৭৭০এর মন্বন্তর নামক গণহত্যার আগে বিশাল পরিমান পণ্য উৎপাদন করছে, বিশাল জাহাজ তৈরি করছে, বিশাল মসজিদ মন্দির তৈরি করছে - সে কেন নম্র হয়ে চৈতন্যের ডাকে সাড়া দেবে? বুদ্ধদেবের মত কেস এটাও। বুদ্ধ রাজার ব্যাটা, তিনি সংগঠন বোঝেন আর তার সঙ্গে জুটল বিশ্বজুড়ে ব্যবসা করা শ্রেষ্ঠী বন্ধুরা - দুয়ে মিলে বৌদ্ধপন্থের রমরমা তৈরি হল। তেমনি চৈতন্যের আরবান ক্যারিশ্মার সঙ্গে জুড়ল সাতগ্রামী/সপ্তগ্রামী শ্রেষ্ঠীরা - বৈষ্ণবপন্থের রমরমা মুঘল দরবার পর্যন্ত ছড়াল। গৌরগণের প্রভাবে আকবর বৃন্দাবনে মুঘল প্রথা ভেঙে গৌড়িয় বৈষ্ণব মন্দির তৈরিতে লাল পাথর ব্যবহার করতে অনুমতি দেবেন! শুনেছি প্রচুর ফরমান বৃন্দাবনের ৫০০

বছরের মন্দিরগুলোয় রাখা আছে। তাই পতিত উদ্ধার আদতে বাগাড়ম্বর। ভদ্রবিত্তের রাগ তো এখানেই - তখন ছোটলোকের রমরমা। রাষ্ট্রপ্রধানদের ছোটলোকেদের পাশে দাঁড়ানোর প্রভূত উদাহরণ সুশীল চৌধুরী [ফ্রম প্রস্পারিটি টু ডিক্লাইন - এইটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল] ওম প্রকাশ [দ্য ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দ্য ইকনমি অব বেঙ্গল] বা বিশ্বেন্দু [পলাশীর পূর্বে বাংলার বাণিজ্য] দিচ্ছেন নবাবি আমলে। আসলে কারিগর ব্যবস্থার পাশে দাঁড়ানোর সেই সুলতানি আমলের ধারাবাহিকতা মুর্শিদকুলি থেকে সিরাজ পর্যন্ত বহমান। কারিগর সমাজ শ্রেষ্ঠী কর্পোরেটের সঙ্গে সম্পাদিত লাখ লাখ টাকার চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে যে কোনও বাহানায় - তার ওপর জোর করার অধিকার শ্রেষ্ঠী বা রাষ্ট্রের ছিল না। জোর খাটালে রাষ্ট্র কারিগর হকারদের পাশে দাঁড়াত। তখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কারিগর ব্যবস্থার স্বার্থে কাজ করত। বাংলাজোড়া স্বনির্ভর কারিগর ব্যবস্থা তো ভদ্রবিত্ত নির্ভর ছিল না - এটা তো চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপিয় ভদ্রবিত্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

মহিলাফোবিক ভদ্রবিত্তের আরও এক সমস্যা হল এই কারিগর ব্যবস্থায় মহিলারা গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে মহিলারা রোজগার করছে, কবিতা লিখছে, পড়ছে, সম্পত্তির অধিকার রাখছে। এটা ভদ্রবিত্তের চক্ষুশূল। ছোটলোক আর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার জন্যে, মুসলমান রাজার সঙ্গে কাজ করার জন্যে ক্ষমতার ২ এবং ৩ নম্বরেরাই যদি অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে চৈতন্যের ভদ্রবিত্ত পরিকরদের কী ধরণের জ্বালা হচ্ছিল সেটা মালুম করা খুব কঠিন কী? শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আজকের বামপন্থী নেতার তুলনা টানতে পারি। চৈতন্য যেমন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, আজকের বামেরা ইংরেজি দক্ষ। দুই পক্ষই সবর্ণ, সামাজিক থাকবন্দীর মাথায় বসে থাকা নেতা। আজকের মানুষেরা মধ্যযুগকে অন্ধকারের যুগ হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে ভদ্রবিত্ত চৈতন্যকে অন্ধকার ভাঙার দিশারী হিসেবে দেখান। সেই দৃষ্টিটা কতটা জায়েজ? আমরা জানি উপনিবেশের আধুনিক যুগ শুরুই হচ্ছে ৩ কোটি বাঙালি অধ্যুষিত বাংলায় ছিয়াত্তরের গণহত্যায় ১ কোটি মানুষকে মেরেফেলা আর ১৯০ বছরের লুঠের কাঠামো তৈরি করার মাধ্যমে।

আপনি যে বলছেন ভদ্রবিত্ত আসছেন বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাম সংগঠন তৈরি, কমিউনিস্ট দল, অন্য বাম দল যেমন আরএসপি তৈরির কাজে লিপ্ত হতে। এই ভদ্রবিত্তের হাতে তৈরি হল সাহিত্যের উপনিবেশিক কাঠামো যেখানে কাব্যের মধ্যে দিয়ে আলাপ আলোচনা তত্ত্বালোচনার শহুরে উদ্যমের

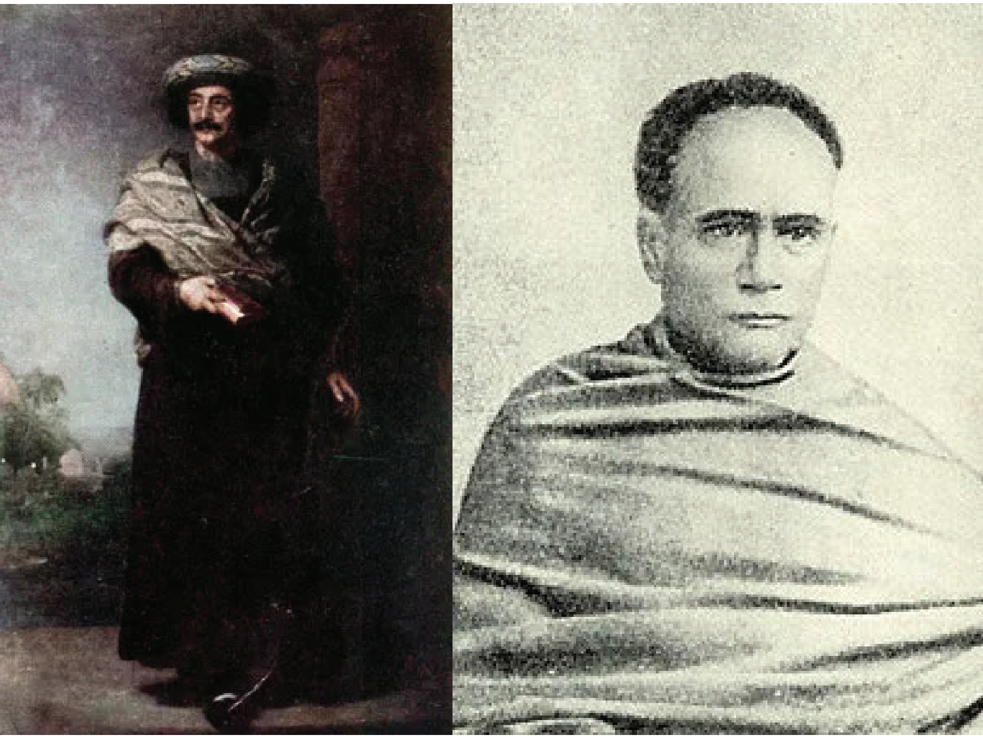

লুঠেরা-খুনি-গণহত্যাকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুই সক্রিয় সহযোগী রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল - শুরু হল কেজো গদ্যের যুগ উপনিবেশপূর্ব যুগকে পিছিয়ে পড়া অন্ধকার ইসলামি সাম্রাজ্যের যুগ আখ্যা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। এবং শ্রীচৈতন্যের আমলে ভদ্রবিত্তের ইসলামোফোবিয়া থেকে শুরু করে রামমোহনের [রায়] হাত দিয়ে যে রাজনৈতিক ইসলামোফোবিক হিন্দুত্বের যুগের সূচনা হল, সেটি পূর্ণতা পাবে তারও ১০০ বছর পরে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

আদিত্য - রামমোহন [রায়] থেকে না কী তার পরে থেকে?

বিশ্বেন্দু - রামমোহন। আপনাকে আমরা দুটো বই পাঠাব, বিদ্যাসাগর [বিদ্যাসাগর নির্মাণ বিনির্মাণ পুনর্নির্মাণের আখ্যান] আর রামমোহনের [রামমোহন ও তাঁর সময় - ভিন্ন চোখে] সময় অবলম্বন করে নবজাগরণের প্রথম পর্বকে ফিরে দেখা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন দেবোত্তম চক্রবর্তী। বিদ্যাসাগর কারিগর সংগঠনের [কলাবতী মুদ্রা] প্রকাশনা আর রামমোহনের প্রকাশক আমাদের বন্ধুলোক। বইদুটো আপনাকে পাঠাব উপনিবেশ বিরোধী কর্পোরেট বিরোধী

চর্চা আর জ্ঞানগঞ্জএর পক্ষ থেকে। ১৭৫৭র পলাশী থেকে ১৮২০তে, রামমোহন যখন বৌদ্ধিকভাবে সক্রিয় হচ্ছেন সেই সময়ের বাংলার ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ বাংলায় সুশীলবাবু (চৌধুরী), ওম প্রকাশ বা নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ নবাবি আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখছেন, তাঁরা কিন্তু এই সময়টার বিশদ আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা এবং অন্য ঐতিহাসিক পলাশীর পরের সময় এড়িয়ে লাফ দিয়ে সক্রিয় রামমোহনের সময়ে প্রবেশ করছেন। এই মধ্যেকার সময়ে মেয়েদের যতটুকু সম্পত্তি রাখার অধিকার ছিল সে সব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আইন করে, রোজগারের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সতী করার হুমকি দিয়ে। সতী করার হুমকি বাস্তবেও রূপায়িত হল। অথচ উপনিবেশের আগে বা কিছু পরের সময় প্রায় কুড়ি জনের মত মহিলা জমিদারের উদাহরণ পাচ্ছি, তিন বিধবা জমিদার নবাবকে ১ কোটি টাকা রাজস্ব দেন। তারা পাবলিক স্ফিয়ারে আছেন। এই সম্পত্তির অধিকার চলে যাবে হেস্টিংসের আমলে হ্যালহেদ আর পণ্ডিতদের উদ্যমে।

আদিত্য - এরকম কী কাজ আছে? এই বিষয়গুলো আমাদেরও জানানেই।

বিশ্বেন্দু - আপনাকে আমরা বেশ কিছু নথি পাঠাব। আমরা ১৭৭০ নিয়ে বই করছি। বইমেলার পরে প্রকাশ পাবে। এই যে পারপিচুয়াল লুঠের সময়, ১৭৫৭য় বাংলায় বিশ্বের প্রথম স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি শুরুর সময় নিয়ে গবেষণা করছি। আমাদের বক্তব্য হল, এই সময়ের যে কাঠামোগত পরিবর্তন আসছে, লুঠেরা সময় তৈরি করার যে প্রক্রিয়া চলছে, তাকে বুঝতে না পারলে তার পরের সময়ের লুঠের কাঠামো বোঝায় খামতি থেকে যাবে [টেগোর ল্যান্ড প্রকল্পটায় কীভাবে শান্তিনিকেতনের জমি দেশিয় সমাজের থেকে কেড়ে ভদ্রবিত্তের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেটা বুঝতে আমাদের যে গবেষণার কাজ চলছে, সেটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম]। উপনিবেশকে বুঝতে গেলে উপনিবেশের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার কাঠামোকে বুঝতে হবে, না হলে বড়সড় খামতি থেকে যাবে।

আদিত্য - এ সব আলোচনা হয়ে ভাল হল। এই সময়টা আমি আরও ভালভাবে জানতে চাইব। আপনাদের কাছে থাকা নথিগুলো যদি আমায় পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়। এ সময় নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করতে চাই। উত্তর ভারতের ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু হিন্দুত্ব-টিন্দুত্বের কাঠামো তৈরির ইন্টালেকচুয়াল কাজ শুরু হয় বাংলা থেকে।

বিশ্বেন্দু - খুব বেশি কাজ আছে বলে মনে করি না, নিলাদ্রি ভট্টাচার্যের পাঞ্জাবের ওপর কাজ আছে, 'দ্য গ্রেট এগরারিয়ান কনকুয়েস্ট' [আদিত্য সমর্থন দিলেন] আর আছে বীণা তলোয়ারের 'ডাউরি মার্ডার', [তাঁকে নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার 'এপ্রোপ্রিয়েশন এন্ড ইনভেনশন অব ট্রাডিশন - দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দ্য হিন্দু ল' ইন আর্লি কলোনিয়াল বেঙ্গল' বইটার কথা বলতে ভুলে গেলাম] এ ছাড়া মেয়েদের ক্ষমতা হারানোর সূত্র হিসেবে আর কাজ নেই। আওরঙ্গজেব যখন মারা যাচ্ছেন দক্ষিণ এশিয়া ১ নম্বর অর্থনীতি, আকবর যখন ক্ষমতায় আসছেন, দক্ষিণ এশিয়া তখন ২ নম্বর অর্থনীতি। এই উল্লম্ফন ঘটছে হকার কারিগর চাষী সমাজের প্রচেষ্টায়। আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার ৫০ বছর পরে বাংলার উপনিবেশিক কাঠামোর দিকে যাত্রা এবং ১২০ বছর পরে রামমোহনের সক্রিয়তা। এই সময়টা ভারতবর্ষের বিশদ ইতিহাস খুব বেশি আলোচিত নয়। কারন উপনিবেশিক সময়ের ইতিহাসের বয়ান শুরুই হচ্ছে রামমোহনের সক্রিয়তাকে সেলিব্রেট করে। কিন্তু আমরা চাষী, হকার, কারিগরের রাজনীতি করি, আমরা জানি উৎপাদন ব্যবস্থায় মেয়েদের কী ভূমিকা সেদিনও ছিল, আজও আছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় যেহেতু মেয়েদের বড় ভূমিকা ছিল, তাই মনুর মত নারী বিদ্বেষী স্মৃতিকারের পক্ষেও মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। সে বাপের বাড়ীর ২৫ শতাংশ সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছে বা শ্বশুরবাড়িতে যে স্ত্রীধন নিয়ে আসত, তার নিয়ন্ত্রণ মহিলার নিজের ছিল, ৩টে ব্যতিক্রম বাদে পুরুষের অধিকার ছিল না তাতে হাত দেওয়ার। আমরা মনে করছি বাংলার অর্থনৈতিক পতনের বড় কারন হল মেয়েদের সম্পত্তি আর রোজগারের অধিকার কেড়ে অন্দরবাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য করানো। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, না হলে ভদ্রবিত্তের সার্বিক অধিকার কায়েম হয় না; উপনিবেশ পূর্ব সময়ের ফেমিনিন [মেয়েলি, সে অর্থনীতি মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ] ইকনমিকে ম্যাস্কুলিন [পুরুষালি, মেয়েদের ভূমিকা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়] ইকনমিতে পরিণত করা যায় না। আমরা দেখছি ১৮০৮এ পাটনা গুরুত্বপূর্ণ বয়ন কেন্দ্র না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ৩ লক্ষের বেশি মহিলা সুতো কাটছেন - কোন সময়ে? যখন ৪০ বছর আগে, অর্থাৎ দেড় প্রজন্মের আগে বাংলা বিহারে ১ কোটি মানুষ মারা গেছে, যখন ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাকে আমরা জমির এনআরসি বলছি, প্রথম সম্পদের প্রাইভেটাইজেশন প্রকল্প বলছি, শেষ হয়েছে। ১৮২০তে ঢাকা জনশূণ্য হয়ে যাচ্ছে। এই সময় নিয়ে বাংলায় গবেষণার কাজ কই? এই সময়ে কর্পোরেটরা কারিগর হকার চাষীর বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন কাঠামো ধাক্কা মারার সময় তৈরি করছে। অবশ্য

আজও আমরা টিকে আছি, কারন আমরা বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতি, আমরা রক্তবীজের বংশ, আমাদের মেরেফেলা শক্ত।

অত্রি - এবারে আমরা আলোকায়ন বা আধুনিকতা নির্মান নিয়ে কথা বলব। আপনি পার্টি কাঠামো আর বিপ্লবের ইতিহাসকে প্রশ্ন করছেন, একে তত্ত্বায়নের জায়গায় আনছেন। এই কাজে আপনি গ্রামসির রেভলিউশন এগেনস্ট ক্যাপিট্যাল, আদতে লেনিনস্ট পার্টি কাঠামোকে প্রশ্ন করা বা বলশেভিক বিপ্লব, তার বিরুদ্ধে গ্রামসির অবস্থানকে ব্যবহার করে লেখা লিখেছেন। পার্টি কাঠমো আর গণতন্ত্রের সম্পর্ক বোঝার জন্যে এম এন [মানবেন্দ্র নাথ, পারিবারিক নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সমাজতন্ত্রী নেতা। বিশ্ববিপ্লবের জন্যে অসংখ্য ছদ্মনাম নেন - মি. মার্টিন, মানবেন্দ্রনাথ, হরি সিং, ডা. মাহমুদ, মি. হোয়াইট, মি. ব্যানার্জী ইত্যাদি। মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম এন রয় নামেই বিখ্যাত। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেন। সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় তিনি ‘রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট’] রায়ের লেখা ব্যবহার করেছেন। সাধারণত বামপন্থীরা এম এন রায় নিয়ে উদাসীন। এই দুটো ক্ষেত্র ইন্টারেস্টিং। গ্রামসিকে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি প্রিজন নোটবুক, তার সাবঅল্টার্ন তত্ত্বের জায়গা থেকে। তাঁর প্রথম দিকের রচনা [খুব বেশি পঠিত নয়] কেন আপনি তাঁকে ব্যবহার করছেন? কেন আপনার সঙ্গে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের ডায়লগের যায়গাটা তৈরি হল?

আদিত্য - রায়ের ব্যাপারটা নিছক ব্যক্তিগত। আমার বাবা ছিলেন এম এন রায়ের খুবই কাছের মানুষ। রায় মারা যান (১৯)৫৪ সালে, আমার জন্ম ১৯৫৭এ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেঁচেছিলেন (১৯)৬০ অবদি। ছোটখাটো চুরির মামলায় তাঁকে মার্ডার করা হয়। এরপরে বাবাকে বলা হল বাড়িটা দেখাশোনা করতে - আপনাকে সেখানে থাকতে হবে। তার আগে আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। ৬২ থেকে আমরা সেই বাড়িতে থাকতে শুরু করি। আমার ছোটবেলা কেটেছে এম এন রায়ের লাইব্রেরি, তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে থাকা বাড়িতে। [বিশ্বেন্দু - তিনি বিশ্ব বিপ্লবের অংশ ছিলেন; আদিত্য সমর্থনে মাথা দোলালেন]। ছোটবেলায় বন্ধুবান্ধব (এর সঙ্গ) আর খেলাধুলো ছাড়া ওনার পারসোনাল লাইব্রেরিতেই আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে। বাবা জীবনের শেষ অবদি সক্রিয়ভাবে রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি জুড়ে ছিলেন ৩০এর দশক থেকেই। ৪৮ অবদি রায় নিজেকে মার্ক্সিস্ট বলছেন।

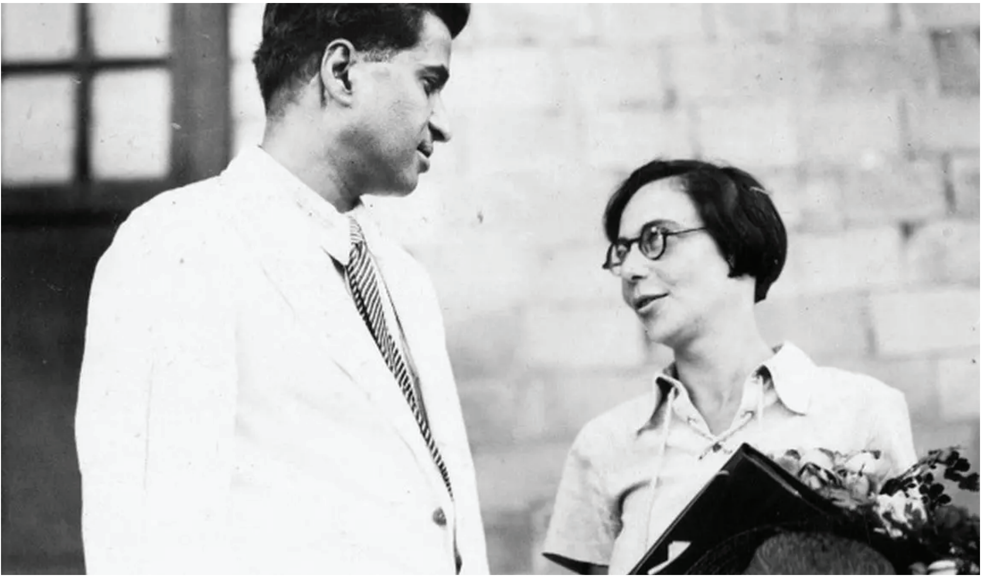

স্ত্রী এলিন গসচলক রায়এর সঙ্গে এম এন রায়

কিন্তু কমিন্টার্ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে, ১৯৩০এর দশকে জেলে থাকাকালীন তিনি অন্য ধরণের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। রায়ের অনেক ইন্টারেস্টিং দিক আছে। এই বিষয়গুলো পড়ার সুযোগ হয় তখন। আর বাবার বন্ধুদের কাছাকাছি থাকার ফলে তাদের কথাবার্তা শোনা, বই পড়া ইত্যাদির ফলে একটা... সফট স্পট শুধু আমার না [অনেকেরই ছিল]... আমি দেরাদুনে তাঁর বাড়িতে বড় হয়েছি। আমার বড় মামাও রয়িস্ট ছিলেন। উনি ছিলেন ফরেন সার্ভিসে। ইংলন্ডে চাকরি ছেড়ে থাকতে শুরু করলেন।

বিশ্বেন্দু - নাম কী ছিল তাঁর...

আদিত্য - সুশান্ত দাস। আরেকজন রয়িস্ট ছিলেন কল্যাণ সিনহা। মায়ের মামা। বারাসাতে বাড়ী ছিল। এটা পারিবারিক যোগেই তৈরি হয়েছে। এক দিকে বাবা আর অন্য দিকে মামা বাড়ির অনেকেই রয়ের কাছের মানুষ ছিলেন। সেইজন্যে ওনার [কাজের] সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা হয় নি। [বিশ্বেন্দু - বামপন্থীরা রয়কে সহ্য করতে পারেন না] হ্যাঁ। কিন্তু আমি সহজে তাঁর কাজ পড়েছি, যদিও তাঁর লেখার মধ্যে অনেকেটাই ইওরোসেন্ট্রিক ব্যাপার আছে, কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছুই আছে [সবার চোখে] ধরা পড়ে না, আমার সে সব তাই পড়তে [বুঝতে] অসুবিধে হয় নি তেমনভাবে।

বিশ্বেন্দু - আমার প্রথম জীবনে রায়ের নাম শুনিই নি প্রায়, অনেক বড় হয়ে রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সংগঠনের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি প্রায় অপরিচিতই ছিলেন।

আদিত্য - এখন বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে। [অত্রি গলা মেলায়] লিবারেশনের এই ঝামেলাগুলো নেই।

অত্রি - আপনার ডিপার্চারটা হয়েই গেল। বিশ্বায়নের যুগে আমরা ঢুকে পড়ছি। যে লেখাটার কথা একটু আগে হচ্ছিল, নক্সালবাড়ি, নর্মদা, নন্দীগ্রাম - আপনার এই অবস্থানের এক্সটেনশন হিসেবে নর্মদা আন্দোলনের যোগ কীভাবে হল?

আদিত্য - আমি যখন পার্টি ছাড়ি, সে সময় প্রায় সব কটা বামপন্থী পার্টি নিওলিবারেল হয়ে যাচ্ছে, চিন্তাভাবনার দিক থেকে তাদের আর নিজস্ব অবস্থান থাকল না। অনেককেই বলতে শুনেছি, বিশেষ করে এম-এল পার্টিগুলো বাদে - অবশ্যই লিবারেশন এই কাতারে পড়ে না - সমাজতন্ত্র আসবে পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে, পুঁজিবাদ তৈরি না হলে সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। তাদের কথা হল, রাশিয়ায় নির্দিষ্ট একটা পরিস্থিতিতে স্তর ডিঙিয়ে বিপ্লব হয়েছিল, তাই এত সমস্যা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল, এই পার্টিগুলো পুরোপুরি গ্লোবালাইজেশনের তর্কটা মেনে নিয়ে সেই প্রকল্পে নিজেদের ফিট করছিল। তাদের অবস্থান হল, আগে গ্লোবালাইজেশন হয়ে যাক, পুঁজিবাদ আসুক, পিছিয়ে পড়া দেশগুলোয় পুঁজিবাদ বিকশিত হোক, তারপরে আমরা সমাজতন্ত্রের কথা ভাবব। নিওলিবারেল ইকনমিতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ধারণা কাজ করেছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সময়ে পার্টির এই তাত্ত্বিক অবস্থানটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমি তখন কাগজে ফ্রিল্যান্স করছিলাম। সেই সময় বিভিন্ন সোসাল মুভেমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাদের মিটিংএ যাওয়া [শুরু হল]। দুএকটা এনজিও ছিল যারা সোসাল মুভমেন্টের সঙ্গে কাজ করত। ওদের সঙ্গেও কাজ করেছি এবং বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। সেই কাজটা করতে গিয়ে আমার মনে হল আসলে সেই সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আইএমএফ, গ্লোবালাইজেশন, স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসির সব থেকে পাওয়ারফুল ক্রিটিক আসছে ঐ জায়গা [সোসাল সেক্টর] থেকে। পুঁজিবাদী ডেভেলাপমেন্ট হবে কী হবে না, এই সব ব্যাপার-ট্যাপারে ওদের মাথাব্যথা ছিল না। সে সময় [নিওলিবারেল ইকনমি

নর্মদা নদীতে জলসমাধি - স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টএর পাওয়ারফুল ক্রিটিক আসছে জনআন্দোলনগুলো থেকে

মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধ অবস্থানে] নর্মদা আন্দোলন ছিল, সিংগ্রৌলির আন্দোলন ছিল - বিভিন্ন ধরণের ডিসপোজেশনের [উচ্ছেদের] বিরুদ্ধে, জমি দখলের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন চলছিল - সবার সঙ্গে মোটামুটি যোগাযোগ ছিল, কিছু না কিছু কথাবার্তা রোজই হচ্ছিল। সে সময় আমি বুঝতে শুরু করলাম, স্তর ডিঙিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর তর্কের সমস্যাটা। এই যে হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের যে পুরো লিনিয়ার ফ্রেম, আসল গলদটা ওখানেই। ওটা না ভাঙতে পারলে, নতুন ভাবনা তৈরি করতে না পারলে আর বিপ্লব-টিপ্লবের মানে থাকবে না। এই সময় থেকেই রিও সম্মেলন সূত্রে আস্তে আস্তে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। [আন্দোলনের] এজেন্ডা হিসেবে খুব ভালভাবে সেই তর্কটা [সাধারণ পরিসরে পোক্ত হয়ে] উঠে আসছে। তখন আরও বেশি উৎপাদন কেন্দ্রিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বের গতিপ্রকৃতি যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে আমরা কতদুরে এগোতে পারব, সে প্রশ্নও জাগছে। পৃথবীর এক চতুর্থাংশের যে লাইফস্টাইল, সেটা যদি সারা পৃথিবী অনুসরণ করে, তাহলে আমাদের [সম্পদ জোগাড় করতে অন্তত] পাঁচটা পৃথিবী লাগবে। একটা পৃথিবী দিয়ে সেই উন্নয়নের কাজ হবে না। অলরেডি আমরা একটা জায়গায় [উন্নয়নের স্তরে] পৌঁছেছি। এটা ম্যাথেমেটিক্যালি ইম্পসিবল, তর্ক করার জায়গাও নেই। আমার খোঁজ ছিল এই লিনিয়ারিটিটা

কীভাবে ভাঙা যায়। সেখানে সোসাল মুভমেন্টগুলোর বক্তব্য কী। এরা কীভাবে ভাবছেন, এরা কীভাবে দেখছেন ভবিষ্যতটাকে। এই ভাবনা ভাবতে ফিলোজফিক্যালি আমি অন্যসব ভাবনার লেখাপত্র পড়তে শুরু করলাম। তখনই মনে হচ্ছিল, মার্ক্সিস্ট ভাবনার কিছু কিছু ডিপার্চারের জায়গা মাওএর [জে দং] কাজ আর আফ্রিকার কন্টেক্সটে [ফ্রাঞ্জ] ফানোর কাজে পাওয়া যায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের বিরুদ্ধেও তাদের বক্তব্য আছে, শুধু পুঁজিবাদ নয় - গোটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেছে। মাও বলছেন হেভি ইন্ডাস্ট্রি, লাইট ইন্ডাস্ট্রি আর এগ্রিকালচার পাশাপাশি হবে, একটা অন্যটাকে উচ্ছেদ করে [তৈরি] হবে না। বুদ্ধবাবু ভাবছিলেন এগ্রিকালচারের জায়গায় যদি ইন্ডাস্ট্রি না আসে তাহলে ইতিহাসের অন্ত হয়ে যাবে। মাওয়ের বক্তব্য পরিষ্কার, এগ্রিকালচার আর ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি চলবে। সেই সময় থেকেই মার্ক্সবাদের ইতিহাসটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখাগেল যে মার্ক্সবাদের গণ্ডীর মধ্যে থেকে বেশি দূর এগোনো যাবে না - ইকলজির ব্যাপারটা - আসলে যে প্রশ্নগুলো তুলে রাখছে, সেগুলো কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে তো যায়ই, আদিবাসী, কৃষক ও কারিগরদের উৎখাত করার বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়।

বিশ্বেন্দু - বাড়তে থাকা উৎপাদনের চাহিদা পূরণের বিষয়টাকে বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখতে চেষ্টা করা যাক। ১৬২৮এ হুগলী থেকে পর্তুগিজদের উচ্ছেদ করতে বাহিনী পাঠাচ্ছেন সম্রাট শাহজাহান। পর্তুগিজেরা হুগলী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে ডাচ আর ব্রিটিশ কর্পোরেটেরা হুগলীতে ঢুকছে, বাংলাজুড়ে ব্যবসা করছে। ১৬৭০-৮০তে, এই ৫০ বছরে ইওরোপে পাঠানোর জন্যে বিপুল পরিমান কাপড়ের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। বাংলার তাঁতিরা ইওরোপিয়দের সুতির কাপড় পরানোর স্বাদ দিচ্ছেন, সুতির আরাম ইওরোপিয়রা ভোগ করছে ইওরোপিয় প্যাচপ্যাচে গ্রীষ্মে। বিপুল চাহিদা বাড়ায় ওম প্রকাশ বলছেন অতিরিক্ত ১ লক্ষ কারিগর কাজ পাচ্ছেন, যে অঙ্কটা সুশীলবাবু [চৌধুরী] মানছেন না [যদিও চাহিদা বৃদ্ধি নিয়ে তিনি একমত]। আমার বলার কথা হল, সেই চাহিদা বৃদ্ধিতে আমরা কিন্তু কেন্দ্রিভূত কারখানা বানালাম না, আমরা ভূমিতলে বাড়লাম, প্রচুর কারিগরের নতুনভাবে দক্ষতা তৈরি হল, তারা কাজ পেল, তাঁতিরা বেশি কাজ করল, আরও তাঁত তৈরি করতে হল ইত্যাদি। আমরা আজ কারিগর ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবি যে প্রশ্নটার মুখোমুখি হই, বড় আকারের শিল্প না হলে আমরা কী আজকের বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করতে পারতাম? এর উত্তরে

আমরা বলি, ৪০০ বছর আগে আমাদের কারিগরদের মহান পূর্বজরা উত্তর উপহার দিয়েছেন। চাহিদা বৃদ্ধি সামলানোর জন্যে বাংলায় বিপুল তুলো চাষ বাড়া সত্ত্বেও বাংলায় মন্বন্তর হয় নি, কাজ করার কারিগরের অভাব হয় নি, আমাদের কেন্দ্রিভূত কারখানা করতে হয় নি।

আদিত্য - ঠিক।

অত্রি - আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, আপনি যে কাজগুলো করছেন, সেই কাজের প্রেক্ষিতে কারিগরদের কাজ যেমন কাঁথার ফোড়, যেমন নৌকো তৈরি ইত্যাদিকে জ্ঞানচর্চা হিসেবে ভাবি নি। মনে করা হচ্ছে এটা জ্ঞানচর্চা নয়। এটার কারন কি আমাদের এখানে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছে, তার মানসিকতা ইওরোপিয় রেনেসাঁস থেকে আসছে বলে? আপনি যখন জ্ঞানতত্ত্বের নির্মাণ নিয়ে কাজ করছেন, আমরা কোনও কিছুকে কীভাবে বুঝব, সেখানে আপনি আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে তত্ত্বচর্চার কথা বলছেন, কিন্তু এই ভেদটা আমরা কীভাবে করব? আমাদের সামগ্রিক যে পড়াশোনা, বোঝাপড়া - সে সব চোখ বুজে ইওরোপিয় কাঠামো [থেকে ধার করা]। এই টুলগুলো [হাতিয়ার] আমরা কীভাবে আবিষ্কার করব। আমার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার মাটির জ্ঞানচর্চা বোঝার স্ট্রাটেজি কী হবে।

আদিত্য - এটা আমাদের সামনে বিশাল বড় প্রশ্ন - হুট করে উত্তর হয় না। কিন্তু আপনি যে সব কথা বলছেন, সেই কথাগুলো নতুনভাবে, নতুন দৃষ্টিকোণ পত্তন করার চেষ্টা করতে হবে। আমার মনে হয়, হয়ত এই ধরণের কাজ অন্য জায়গায় চলছে, যেটা আমরা জানি না।

বিশ্বেন্দু - গান্ধীবাদীরা এই কাজ করেছেন। এক্ষুণি মনে পড়ছে [অনুপম মিশ্রর] 'আজ ভি খড়ি হৈ তলাও' এর কথা। এই ধরনের দেশজ জ্ঞানচর্চা নথিকরণের কাজ সোসালিস্টরা করেছেন, গান্ধজীবাদীরা তো করেইছেন। কিন্তু বামপন্থীরা উদ্যোগী হন নি। স্মৃতিসভ্যতার জ্ঞানচর্চায় ঢোকার জন্যে দরজা নেই, এই জ্ঞানচর্চার পরীক্ষা দিতে হয় বাজারের কাছে, সে বাজারের অভিজ্ঞতা, ফিডব্যাক নিয়ে আবার সে কর্মশালায় এসে তাকে প্রয়োগ করে নতুন করে উৎপাদন করে - এই জ্ঞানচর্চার কাঠামো আমাদের এখানে তৈরি ছিল, আমরা আস্তে আস্তে সেটাকে ধ্বংস করার উদ্যম নিচ্ছি। কারন আমরা যারা ভদ্রলোক, আমাদের জীবনে সকালে টুথপেস্ট থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ের ঘুমের বড়ি - সব নিয়ন্ত্রণ করে কর্পোরেট। তাই ভদ্রবিত্তের জীবনে,

জনগণজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃত অনুপম মিশ্র

কাজে স্মৃতি সভ্যতা নেই। যে জ্ঞানচর্চা লেখার কৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আমরা জ্ঞানগঞ্জ থেকে বুঝতে চেষ্টা করছি। উপনিবেশে সাহিত্য বুঝতে লেখা নির্ভর কাজ বুঝলাম, তার বাইরে কবিতার নির্ভর বিপুল সংখ্যায় শ্রুতি সাহিত্য, আলাপ আলোচনাকে বর্জন করলাম। ফরহাদ মজহার একবার বলেছিলেন একমাত্র ভদ্রবিত্তই বইপড়ে জ্ঞানার্জন করে, সেখানে তর্ক-বিতর্ক মৌখিক আদানপ্রদান করে জ্ঞানার্জন মুখ্য কাজ নয়। কিন্তু কথা বলে, তর্ক-বিতর্ক করে জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে ব্রিটিশপূর্ব সময়ে। আমি আজ যে প্রবন্ধ লিখি, সেটায় ছন্দের জায়গা সীমিত, অনেক বেশি জার্গনঋদ্ধ, সেই চর্চায় স্মৃতি কৃষ্টির মানুষদের প্রবেশাধিকার সীমিত। আমাদের গোটা ব্যবস্থা নিয়ে কি নতুন করে ভাবতে হবে? আজকে যে উপনিবেশিক কাঠমো তৈরি হয়েছে,

সেই কাঠামোকেই কী প্রশ্ন করা দরকার?

আদিত্য - ইওরোপিয় নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমাদের হাতে রিসোর্সেস কী? আমি উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে কাস্টের প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করছি। কারন কাস্টের প্রশ্ন হল ডিভিশন অব লেবার। সবার নিচে আছে শূদ্র। আমরা যখনই বিউপনিবেশায়নের কথা ভাবি, তখনই চলে যাই ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানকাণ্ডের দিকে। ভারতের প্রাক-উপনিবেশিক জ্ঞান শুধু কী তাই? আমি সেটাকে পুরোপুরি খারিজ করছি না, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশরা আসার পরে যেভাবে আমাদের পরম্পরা নতুন করে পরিবেশিত হয়েছে তাতে ব্রাহ্মণ্যবাদই কেন্দ্রে থেকেছে। সেটাকে আমাদের বিকেন্দ্রিভূত করতে হবে, যাতে অন্যান্য সব ধারা-উপধারাকে আমরা আবার আলোচনায় আনতে পারি।

বিশ্বেন্দু - আমরা তো শূদ্র সভ্যতায় দাঁড়িয়ে আছি।

আদিত্য - এখন যদি বিষয়টাকে আমরা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদীদের মত করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে কেন্দ্রে রেখে না দেখে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে যে জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে, সেটা হল, নতুন তত্ত্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে নানান ধরণের জ্ঞানচর্চার কথা - সেটা এক দিক থেকে দেখতে গেলে শূদ্র জ্ঞানচর্চা বলা যায় আবার অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে কারিগর-চাষী-আদিবাসীর জ্ঞানচর্চাও বলার সম্ভাবনাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। আমার মনে হয় শূদ্র ও কারিগর-চাষী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তত্ত্বায়নের সংযোগটা অনেক বেশি সফল হবে। এখন পর্যন্ত আমরা যেটা করেচলেছি, তার সঙ্গে মাটির সম্পর্ক নেই, কেননা তার নিশ্চিত একটা ব্রাহ্মণ্য দূরত্ব রয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে ইওরোপিয় নির্মাণের গজদন্তমিনার - ফলে দূরত্বটা আরও বাড়ে। এই দূরত্বটা কাটিয়ে ওঠা দরকার এবং তত্ত্ব তৈরি করার কাজটাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার দরকার। আমার মনে হয় এই জায়গাগুলো বেশি করে দেখতে হবে।

বিশ্বেন্দু - আমরা কারিগর সংগঠন করি। আমাদের এক বন্ধু আছেন নারায়ণ মাহাত। নারায়ণ বংশ পরম্পরায় কবিরাজ, ওঝা। ওঁর বংশের দু'দিকের মানুষ স্বাস্থ্যকর্মী। আমরা বছর দশেক আগে বিভিন্ন পরম্পরার সমাজের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, তাদের জ্ঞানচর্চা ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আয়ুর্বেদ কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য চর্চা। তার উপসর্গ কিন্তু সংহিতা। অর্থাৎ আয়ুর্বেদের সংহিতাকারেরা বিভিন্ন সমাজ থেকে স্বাস্থ্য ইত্যাদির জ্ঞান সংগ্রহ করেছে বলেই সে সংহিতা

প্রয়াত দুই কারিগর-শ্রেষ্ঠ সংগঠক নেপাল সূত্রধর, মধুমঙ্গল মালাকার। মধুমঙ্গল হাড়জোড়া চিকিতসকও ছিলেন

আখ্যা পাচ্ছে - অথচ চরক শুশ্রুত ভগভট্ট যে সব সামাজিক স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা জ্ঞান সংগ্রহ করছেন, তার সূত্র রেখে যাচ্ছেন না। সামাজিক জ্ঞান, মুখাবয়বহীন দরবারি জ্ঞানে রূপান্তরিত হল আয়ুর্বেদে। যদি সঙ্ঘের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাহলে এই জ্ঞানচর্চাগুলো নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

আদিত্য - আমি এটাই বলতে চাইছি। ওদের [সঙ্ঘীদের] প্রত্যেকটা স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ওরা কিন্তু শুধুমাত্র প্রকাশ্যে একটা বড় হিন্দু ফোল্ডে সবাইকে নেওয়ার কথা বলছে না। তারা যে গ্রামে যাচ্ছে, যে বস্তিতে যাচ্ছে, সেখানকার লোকেদের আচার আচরণ বোঝার চেষ্টা করছে। সেখানকার কালচার, সেখানকার ইতিহাস ইত্যাদি জানছে এমন কী এপ্রোপ্রিয়েট করারও চেষ্টা করছে। তারা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রোমোট করার চেষ্টা করলেও, ফ্রেমটা ব্রাহ্মণ্যবাদ থাকলেও, গ্রাসরুটে কিন্তু তারা সেই বিষয়টা সামনে আনে না বলাটা বোধহয় ঠিক নয়, কায়দা করে এই ভাবে আনে যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতিও যথেষ্ট জায়গা থেকে যায়। এই সব জায়গায় আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের তো বিষয়টা বুঝতে হবে।

বিশ্বেন্দু - আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখলাম - কোচবিহারে লোহারেরা [সমাজে] যে ধরণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আছে সেটা ৩০০ কিমি দূরে দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে নেই। ভূগোল আলাদা, সমাজ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা, স্বাস্থ, পুষ্টি ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমাদের স্থানিক বৈচিত্র, আমাদের বহুধা বৈচিত্র, তাকে দিয়ে কেন্দ্রিয় জ্ঞানচর্চাকে ধাক্কা আমার জায়গাটা কী তৈরি করতে হবে না? আমরা সেটা প্রয়োগ করতে পারছি কী না, সেটাও বড় প্রশ্ন।

আদিত্য - আমার তো মনের হয়, আমাদের কাজগুলো এই জায়গাগুলোতেই নিবদ্ধ করতে হবে...

বিশ্বেন্দু - যে জন্যে কেরলে আয়ুর্বেদ প্রচারে স্পষ্টভাবে কর্পোরেট কাঠামোয় সেজে উঠেছে। কারন আয়ুর্বেদ দরবারি। তার জ্ঞান কাঠামোটাই কর্পোরেট, কেন্দ্রিভূত। স্থানীয় বিকেন্দ্রিভূত চিকিৎসা ব্যবস্থা তার মত করে টিকে আছে। যে সব বাচ্চার বুকের চামড়ার তলায় পেশী তৈরি হয় না, মাথার খুলি ঠিক মত তৈরি হয় না - শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি দেখা যায়, আমাদের সঙ্গঠনের সাঁওতাল দিদি সে সব সদ্যজাতর চিকিৎসা করেন। সংগঠনের প্রয়াত সম্পাদক মধুদা [মধুমঙ্গল মালাকার] শোলার কারিগর - তিনি সারা বিশ্ব ঘুরেছেন শোলার কারিগরি নিয়ে, কিন্তু হাড়জোড়া চিকিৎসকও ছিলেন - আজও তার পরিবার সেই কাজ করেন পরম্পরার কারিগরি তৈরি করা ছাড়াও। এই নাম ডাক সত্ত্বেও মধুদার নিজের গ্রামে চায়ের দোকান চালাতে অসুবিধা হয় নি। আমাদের বন্ধু দীপঙ্করদার [শিক্ষক দীপঙ্কর দে] স্ত্রীর আঙ্গুল ভেঙে গেলে দুদিনে সারিয়েছেন। মধুদা বলতেন হাড় যদি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়োও হয়ে যায় তাহলেও তাঁর চিকিৎসায় এক সপ্তাহতেই হাড় এমনভাবে জুড়ে যাবে যে সেই ব্যক্তি ফুটবল খেলতে পারবে। আমরা এই চিকিৎসা ব্যবস্থা নিলাম না। সেই গ্রামগুলোয় এখনও এই চিকিৎসা চলে। কত দিন থাকবে আমরা জানি না। বিকেন্দ্রিভূত সমাজের জোর আর কেন্দ্রিভূত জাতিরাষ্ট্রের সমস্যালোকে যদি আমরা না তুলতে পারি, এই জোরের উদাহরণগুলোকে যদি আমরা না সামনে আনতে পারি, তাহলে সমস্যা। এই পরম্পরাকে আমাদের জীবনে ব্যবহারের জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। মাথায় রাখতে হবে এই চিকিৎসকেরা পেশাদার নয়। যেমন মধুদারই অঞ্চলে নুরুল ইসলাম আছেন, তিনি ব্যাথার [নাশক] তেল তৈরি করেন, সে তেল আমরা ব্যবহার করি। নুরুল রাজমিস্ত্রী। শ্বশুরবাড়িতে সে এই চিকিৎসা শিখেছে। সে পেশাদার চিকিৎসক নয়। আদৌ পেশাদারিত্ব অর্জন জ্ঞানচর্চার জন্যে জরুরি কীনা সেটা বোঝারও দরকার আছে।

অত্রি - আমাদের আলোচনা যে দিকে যাচ্ছে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। আপনি যেটা বললেন, আমাদেরও মনে হচ্ছে সঙ্ঘও তো লোকালাইজড কাজ করছে। সঙ্ঘের যে উপনিবেশ বিরোধিতা - যাকে আমরা ছদ্মউপনিবেশ বিরোধিতা আখ্যা দিই, সে শুধু উপনিবেশ বিরোধিতাই প্রিটেন্ড করছে, কিন্তু সে এই বিরোধিতাকে তত্ত্বায়িতও করছে না, একই সঙ্গে পপুলারলি তাদের বিষয়টা

বলছেও। আমাদের প্রশ্ন হল, এর কাউন্টার করতে গিয়ে কোন কোন পয়েন্টে কোন কোন জায়গায় নিজেদের উপনিবেশ বিরোধী চর্চার স্পেস তৈরি করতে হবে? সেই কাজ করতে গেলে আমাদের নিজেদের ভাষা তৈরি করতে হবে। তবেই আমরা লড়তে পারব। সঙ্ঘের এই প্রাকটিশগুলো দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে - ওরা কোথায় ল্যাগ করছে [কোথায় খামতি আছে]।

আদিত্য - ল্যাগ বলব না, ওদের [উপনিবেশ বিরোধিতার] ফ্রেমটাই হল ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাকে না ভাঙতে পারলে সমস্যা। পুরাণের সময় থেকে একধরণের একটা কন্টিনিউটি চলছে। আমি বলছি না আধুনিক যুগে পরিবর্তন হয় নি, তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিস যেমন ন্যাশনালিজম-টিজম জুড়ে একটা অন্য চেহারা নিয়েছে। কিন্তু এই যে নন-ভেদিক ট্রাইবগুলোকে হিন্দুত্বের ফোল্ডে নিয়ে আসা, এবং নিয়ে আসার জন্যেও নিজেদের চেহারা পাল্টাতে রাজি হওয়া [বিশ্বেন্দুর মন্তব্য বামপন্থীদের মত নয়]। না, নয়ই তো। সেই জন্যে তারা নিজেদের ফর্মটাও পাল্টাতে রাজি। জেএনইউ আইসা-র [সিপিআই এম এল লিবারেশনের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন] মিটিং ছিল ২১এ জানুয়ারিতে। অচিন বিনায়কও ছিলেন। তিনি বললেন [সঙ্ঘ ও বিজেপি] একমাত্র পার্টি যার স্প্লিট হয় নি। আমার মতে তাদের মধ্যে স্প্লিট হয় নি এই জন্য যে তাদের একটা নির্দিষ্ট লাইন থাকলেও সেটাকে বাস্তবে ব্যবহারে নামাবার ক্ষেত্রে তারা প্রচুর জায়গা ছেড়ে ছিলেন [বিশ্বেন্দুর মন্তব্য, তারা বদলাতে জানে] - এটাই একমাত্র ঠিক লাইন, একই কাজ একইভাবে আমাদের করতে হবে, এমন কোনও ব্যাপার নেই। মোটামুটি একটা ফ্রেম আছে। তার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে প্রচুর জায়গা আছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম চিত্রকূট ইত্যাদি অঞ্চলে যেভাবে কাজ করে, সেটা নর্থ-ইস্টে বা অন্য অঞ্চলে ট্রাইবালদের মধ্যে কিন্তু করে না। প্রত্যেকটা জায়গায় তাদের আলাদা স্ট্রেটেজি আছে। শুধু ট্রাইব না, সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল শূদ্র মহাশূদ্র বা দলিতেরা। [বিশ্বেন্দু - নমঃশূদ্রদের বিশাল সংগঠন তৈরি করেছে]। হ্যাঁ। ওদের চেষ্টা কীভাবে টেনে আনা যায়... ধর্ম থাকবন্দীতে সাবঅর্ডিনেট স্ট্যাটাসে রেখেও কীভাবে তাদেরকে নিজেদের ফোল্ডে নিয়ে আসা যায়, এই চ্যালেঞ্জটা তারা নিয়েছে।

বিশ্বেন্দু - এই চ্যালেঞ্জটা আমরা নিই নি, ফাঁকা রেখে দিয়েছি। ইতিহাস লেখার প্রশ্নে ফিরে আসি। আবার ফিরে যাই শাহজাহানের আমলে [জ্ঞানগঞ্জ গবেষক দলের নবীন গবেষকের নাম সাজাহান। সে রেকর্ডিং করছিল। উপস্থিত চারজনের

মধ্যে হাস্যরোল উঠল]। তাঁর প্রধান সচিবের নাম চন্দর ভান ব্রাহ্মণ। তাঁকে নিয়ে কাজ করেছেন রাজীব কিনরা 'রাইটিং সেলফ, রাইটিং এম্পায়ার' গ্রন্থে। চন্দর ভানের অন্য লেখাপত্র যেমন কাব্যের বই চাহার চমনের সঙ্গে দিল্লির একটা ইতিহাস লিখছেন, শুরু করছেন যুধিষ্ঠিরে শেষ করছেন শাহজাহানে পৌঁছে। কোন রাজা কত দিন রাজত্ব করছেন, সেটাও বলছেন [অত্রি জুড়লেন বইটার নাম হল 'তারিখইরাজইদিল্লি']। এই যে ইতিহাস লেখার পরম্পরা ছিল - মাথায় রাখতে হবে, বইটা কিন্তু ফারসিতে। আপনি কী মনে করেন, এই যে ইতিহাস লেখার তরিকা ছিল, যে ইতিহাস লেখার তরিকা বাতিল হয়ে গেল, তার সঙ্গে কী আমরা কোনও রকম বোঝাপড়া আজকের দিনে করতে পারি?

আদিত্য - না, আমার মনে হয় অন্য ব্যাপার আছে। আমি মনে করি ইতিহাসটাই আধুনিক ইওরোপিয় [ধারণা]। এক ধরণের ইতিহাস লেখার পরম্পরা আছে, বুদ্ধিস্টদের মধ্যে আর ইসলামে আছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এটা নেই। আমার কেমন যেন মনে হয়, উপনিবেশের প্রথম সময়ে কলোনিয়ালিস্টরা বলত ভারতবর্ষের হিন্দুদের ইতিহাস নেই। অনেকের আঁতে ঘা লেগেছে - এটা কী করে হতে পারে - হিন্দুদের ইতিহাস নেই মানে ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই। রোমিলা থাপার এই বিষয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন - যেমন ওনার গুরুত্বপূর্ণ বই 'পাস্ট বিফোর আস'... অন্য অনেকেও প্রমান করার চেষ্টা করেছেন আমাদের এখানেও ইতিহাসের ধারণা ছিল। কিভাবে নানান জিনিসকে আমরা ইতিহাস হিসেবে দেখব তার বয়ান। আমার মনে হয় এই পদ্ধতিটা ইতিহাস নয়। আমরা আসলে একটা মিথিক্যাল অবস্থায় থাকি। লিনিয়ারিটি বা সার্কুলারিটি নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু আমি সেই বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। আমার মনে হয় এই পদ্ধতিটা আসলে পৌরাণিক, যেখানে মিথিক্যাল সময় আর বাস্তব জগতের সময়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা হয় না। একই সময় অনেক কিছু ঘটছে। পুরাণে যেমন ঘটে। যেমন আমরা মহাভারতে দেখি। সেখানে কিন্তু অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের তফাত নেই। পুনর্জন্মের ব্যাপারটা, ট্রান্সমাইগ্রেশন; সে সব গল্পগুলোয় কোনটা অতীত, কোনটা বর্তমান, কোনটা ভবিষ্যৎ আলাদা করা যায় না। এই পদ্ধতিটা কিন্তু যাকে আমরা হিস্ট্রি বলে জানি তার সঙ্গে যায় না। আমাদের ভাষায় ইতিহাস শব্দের আলাদা মানে ছিল। আমি জানি না এর সঙ্গে কাস্টের সম্পর্ক আছে কী না। থাকলেও থাকতে পারে। আমরা এই দেহটাকে যেমন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নাশ করে দিই, তারপরে আর কোনও চিহ্ন থাকে না - পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে যায় - এইভাবেই

আমাদের টেক্সট, ডকুমেন্টেশন ইত্যাদির প্রতি মনোভাব দেখাযায়। আমরা জানি না আমাদের নাট্যশাস্ত্রের টেক্সট কে লিখেছেন, কোন যুগে লিখেছেন, হয়ত বলি এই শতক থেকে ঐ শতক - খুব বেশি হলে আন্দাজ করছি চার শতকের মধ্যে কোনও একটা সময়ে। ভরতমুনির নাম জানি, তার বেশি কিছু জানি না, কৌটিল্য সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই ডেটিংটা তো হাল আমলে হয়েছে [বিশ্বেন্দু বললেন বেদ আমরা দেখি ম্যাক্সমূলারের কাজের মধ্যে দিয়ে]। এটা আমাদের স্বভাব বলা যায়। মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ শুদ্ধু আমাদের সমস্ত আধুনিক ইতিহাসবিদদের এটা স্বীকার করতে বাধে যে আমাদের সমাজের মানসিক গঠনটা হয়ত অন্যরকমের ছিল। এখানে কোনও জিনিস প্রিজার্ভ করা হত না। যা হত মৌখিকভাবে, এটা সঙ্গে কাস্টের সম্পর্ক থাকতে পারে। যে মুহূর্তে এটা লিখিত হল, সেই মুহূর্তে সেই জ্ঞানটা ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। জ্ঞানটাকে যদি একটা শ্রেণী বিশেষের হাতে 'সুরক্ষিত' রাখতে হয়, তাতে মৌখিক রাখাই ভাল, তাতে বিপদ কম। বুদ্ধিস্টদের মধ্যে ইতিহাস লেখার চল আছে - হিন্দুদের সবই মৌখিক।

বিশ্বেন্দু - বুদ্ধপন্থ নিয়ে আমাদের অন্য ভাবনা আছে। বুদ্ধ রাজার ছেলে, সমাজের সিইও। তার বন্ধুরা বিশাল বিশাল শ্রেষ্ঠী যেমন অনাথপিণ্ডদ। তারা যৌথভাবে মূলত কেন্দ্রিভূত কাঠামো তৈরি করলেন তৈরি হল বৌদ্ধপন্থ। যেটা আদতে কর্পোরেটের দর্শনের সঙ্গে যায়। যে জন্যে বড় বড় মঠগুলোয় পড়াশোনা করতে পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হত। যারা কেন্দ্রিভূত কাঠামোয় থাকলেন না তারা গেলেন তন্ত্রে তৈরি হল বৌদ্ধতন্ত্র। কেন্দ্রিভূত বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক রোমান্টিসিজম আছে ভদ্রবিত্ত সমাজে। আমরা যারা চাষী কারিগর হকার সমাজের রাজনীতি করি, তারা দেখছি সেই মঠে পড়াশোনা করতে ঢোকার জন্যে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে নাঢ়পাদ বা অতীশ দীপঙ্করের মত পণ্ডিতদের কাছে। এই পড়াশোনা জগতে ঢুকতে পারছেন সে সব পরিবারের সন্তান, যাদের কয়েক প্রজন্মের লেখাপড়ার চর্চা আছে। আজকেও হাজার বছর পরেও সেই এন্ট্রান্স টেস্টের রমরমা দেখি। বুদ্ধিস্টরা আমাদের একটা কর্পোরেট কাঠামো দিয়ে গেছেন। আপনি কী মনে করছেন?

আদিত্য - আমি এইভাবে ব্যাপারটা দেখি নি। ভাবতে হবে।

বিশ্বেন্দু - রমেশচন্দ্র মজুমদার 'কর্পোরেট লাইফ ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া'য় বলছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছোট ছোট থাকার জায়গা [সাজ্ঘা] গ্রামের বাইরে রয়েছে

- গ্রামের সঙ্গে তার যোগ থাকছে শুধু ভিক্ষে করতে আসার সময়টুকুতেই। আমরা একটা ধারণা তৈরি করেছি পাল আমলে বাংলার জনগণ বৌদ্ধ ছিল; আদৌ এটা বৌদ্ধ যুগ কী না, রাজা যদি বৌদ্ধপন্থীও হয়, প্রাজারা বৌদ্ধপন্থী কী না জানি না। মুঘল আমলে রাজার পালন করা ধর্ম আর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজার ধর্ম আলাদা। তবে সে সময়ে রাজা বা রাষ্ট্রের ধর্ম বলতে কিছু ছিল না - বিশেষ করে জাতিরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে, এটা ইওরোপিয় কাঠামো [সৈয়দ নুরুল হাসান, মধ্যযুগে ভারতে রাষ্ট্র-ধর্ম প্রবন্ধে বলছেন, ১৫৫৬ আউসবার্গ চুক্তি বলে বিশ্বে প্রথম বারের জন্যে বলা হল রাজার ধর্মই হবে প্রজার ধর্ম। বিশ্বের বহু অঞ্চলে এই ধারণাটি প্রযুক্ত হয়েছে, এমন কী বিংশ শতাব্দের মধ্যভাগেও ভারতবর্ষের হায়দারাবাদকে মুসলমান রাষ্ট্র বলা হত, তার কারন ছিল সেখানকার রাজা, নবাব ছিলেন মুসলমান, যদিও অধিকাংশ প্রজা অমুসলমান এবং কাশ্মীরকে বলা হত হিন্দু রাজ্য কারন তার রাজা ছিলেন হিন্দু যদিও অধিকাংশ প্রজা মুসলমান]। আমরা কারিগরেরা যারা বিশাল বিশাল কামান তৈরি করতাম, ৫ লক্ষ চতুরঙ্গ যাওয়ার রাস্তা তৈরি করতাম, কোনার্কের মন্দিরের ৮০ ফুটের লোহার বিম তৈরি করতাম, পাহাড় না ভেঙে, শুধু ছেনি বাটালি দিয়ে কুঁদে মন্দির মসজিদ তৈরি করেছি, আমাদের দেবতার বাহন হাতি - এই জ্ঞানচর্চা, দক্ষতা, কাঠামো সব ছোটলোকেদের হাতে, একটাও বামুন-কায়েত-বদ্যিদের নিয়ন্ত্রণে নেই, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেই জোর নেই যে সে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যার জন্যে রাষ্ট্রকে বার বার প্রতিস্পর্ধী সমাজকে ধাক্কা দিতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে

সৈয়দ নুরুল হাসান

হচ্ছে - আইন করে, বুদ্ধি প্রয়োগ করে জাতিরাষ্ট্রের সময়ের মত সমাজ পাল্টাতে পারছে না। আমাদের এক বন্ধু [সোমনাথ রায়] এই সময়কেই সমাজতন্ত্র আখ্যা দিচ্ছেন, অর্থাৎ সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকা সময়। আপনাকে প্রশ্ন আমাদের কি এই বিষয়টাকে নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় আসে নি?

আদিত্য - আমার মনে হয় এগুলোই দরকারি কথা। এই জায়গাটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে মার্ক্সিজমের প্রভাবের দরুন হিসেবের মধ্যেই আসে নি। তারা আসলে জনগণের বা নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস না লিখে টেকনলজি বা শ্রেণী সংগ্রাম খুঁজতে গেছেন। ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, ও অন্য মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদদের কাজ এত ভাল ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও যে জায়গায় মার খেয়ে যায় সেটা হল মার্ক্সীয় কাঠামোর মধ্যে ভারতের ইতিহাসকে ফিট করার চেষ্টা - ফলে তার বাইরে অনেক কিছুই থাকে যেটা তাদের নজর এড়িয়ে যায় [বিশ্বেন্দু - ইরফান হাবিবকে দেখাতে হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটছে, পুঁজিবাদের উত্থান হচ্ছে, ফলে মুঘল যুগের পতনে কলোনির বিকাশ ঘটছে কালের নিয়মেই। এটাই ইতিহাসের বাধ্যবাধকতা। গৌতম ভদ্রকে দেখাতে হচ্ছে মুঘল সামন্ততন্ত্রে কৃষক বিদ্রোহ ঘটছে। এটাই তো মার্ক্সীয় কাঠামোর মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকছে]। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানেই আমাদের সব থেকে বেশি কাজ দরকার। মার্ক্স যে কাজ ব্রিটেন নিয়ে করেছেন, ইওরোপ নিয়ে করেছেন, সেটা আমাদের ভারতীয় সমাজ নিয়ে করতে হবে। আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, আমাদের সমাজের চালিকা শক্তিটা কী। এখনও পর্যন্ত, আমরা মার্ক্সিসটরা যা করে এসেছি - আমি যখন কলেজের সময় পড়তাম, তখন খুবই ইম্প্রেসড হতাম, এখন যখন পড়ি মনে হয় প্রত্যেকটা জায়গায় গণ্ডগোল আছে। এত কিছু বিষয় এদের নাগালের বাইরে থেকে গেছে - যা কিছু ঐ ফ্রেমে ফিট হচ্ছে না, সব বাদ পড়ে গেছে। কাস্ট নিয়ে কাজ করেছেন আর এস শর্মা ইত্যাদিরা, সেখানেও কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায়, কোনও ভাবে একটা নির্দিষ্ট মেটিরিয়ালিস্ট বা ইকনমিক ব্যাখ্যা দিতে হবে বলে যে জায়গাগুলোতে সংঘাত আছে সেগুলো নজরে পড়ে না।

বিশ্বেন্দু - প্রসন্নন পার্থসারথি 'হাউ ইওরোপ গ্রিউ রিচ এন্ড এশিয়া ডিড নট'এ বলছেন উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র এত সহজ শর্তে তাকাভি ঋণ দিচ্ছে কারিগর চাষী হকারদের সেটা ইওরোপিয় প্রশাসকেরা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কারন তারা তো নিজেদের দেশে চাষী কারিগর হকার মৎস্যজীবী পশুচারকদের ওপর উপনিবেশ চাপিয়ে এসেছে [কার্ল উইনারলিন্ড, 'ক্যাজুয়ালিটিজ অব

ক্রেডিট, দ্য ইংলিশ ফিনানসিয়াল রেভলিউশন ১৬২০-১৭২০' বইতে বলছেন কীভাবে ইংলন্ড [এবং মেট্রোপলিটন হতে চাওয়া পশ্চিম ইওরোপিয় দেশগুলি] বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ তৈরির আগে নিজেদের দেশে 'ছোটলোক'দের ওপর উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলছেন ১৬০০ থেকেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির বিকাশ এবং সম্পত্তির অধিকার নতুন কাঠামোয় সাজিয়ে তোলার ফলে টিউডর আর স্টুয়ার্ট আমলে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমিহীন, কাজহীন, গৃহহীন, উদ্বৃত্ত হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হল - The fact that the newly improved agrarian techniques required less labor input meant that additional people were now added to the ranks of the propertyless and unemployed. Although the agricultural revolution would eventually make England a net-exporter of grain by the second half of the seventeenth century, the necessary restructuring of production methods and property relations substantially destabilized Tudor and early Stuart society]। বাংলায় আলিবর্দি একইভাবে হাত খুলে তাকাভি দিচ্ছেন ৫টা বর্গী আক্রমনের মুখে পড়া কারিগর চাষীদের।

আদিত্য - আপনারা যাদের ছোটলোক বলছেন [বিশ্বেন্দু - বাংলার প্রেক্ষিতে বলছি কিন্তু]। ঠিক। তাদেরকে অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা শূদ্র-

উপনিবেশ বিরোধী তাত্ত্বিক, অঙ্ক ঐতিহাসিক চন্দ্র কান্ত রাজু

অতিশূদ্রও বলতে পারি - তারা তাদের নিজেদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিচয় দলিত বহুজন হিসেবে দিয়ে থাকেন - তাদের মধ্যে একটা বিশাল বড় উদ্যম দেখা যাচ্ছে যে তার কেন্দ্রে নতুন জ্ঞান তৈরির প্রশ্ন রয়েছে। তাদের ইতিহাস, জ্ঞানচর্চা ইত্যাদিকে মাথায় রেখে যদি কাজ করি ভাল হয়। এটাও মাথায় রাখা দরকার যে হাজার বছরের নীরবতা ভেঙে যখন তারা নিজেদের ইতিহাস লিখছেন এবং জ্ঞানকর্ম তৈরি করছেন, তখন আমাদের ভূমিকা বড় জোর সমর্থকের হতে পারে। তা যদি মাথায় না রাখি তাহলে নানান ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে - আবার সবর্ণ এসে আমাদের আওয়াজ কেড়ে নিচ্ছে - এমন একটা ভয় থাকা স্বাভাবিক। আরেকটা সমস্যা হল, উপনিবেশের ধাক্কায় ইতিহাস বলে যে বস্তুটা আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের হাতে এল, তার আগেই আমাদের সম্বন্ধে পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এই ধরণের ধারণা বদ্ধমূল হয়েগিয়েছিল, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা আর ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা যেন ধর্ম-কর্ম ছাড়া কিছুই করি না। যারা এই ধারণা থেকে বেরোবার চেষ্টা করেছেন তারা হয় মার্ক্সবাদীদের মত শ্রেণীসংগ্রাম খুঁজবার চেষ্টা করলেন নয়ত কাস্ট/জাতি কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করলেন। জ্যোতিবা ফুলে থেকে পেরিয়ার অবদি যারাই এই দিকে গিয়েছেন তারা একদিক থেকে ধর্মকেন্দ্রিতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন নি। হয় হিন্দু নয় বৌদ্ধ না হয় ইসলাম ইত্যাদি। কিছুটা কাঞ্চার কাজে পাচ্ছি - উনি বলছেন হিন্দু নয়, শূদ্ররাই সভ্যতা তৈরি করেছে - আমাদের কাজ থেকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিকাশ হয়েছে। এই বিষয়টা আমাদের ভাল করে ধরা দরকার - ভারতবর্ষে সাধারণ

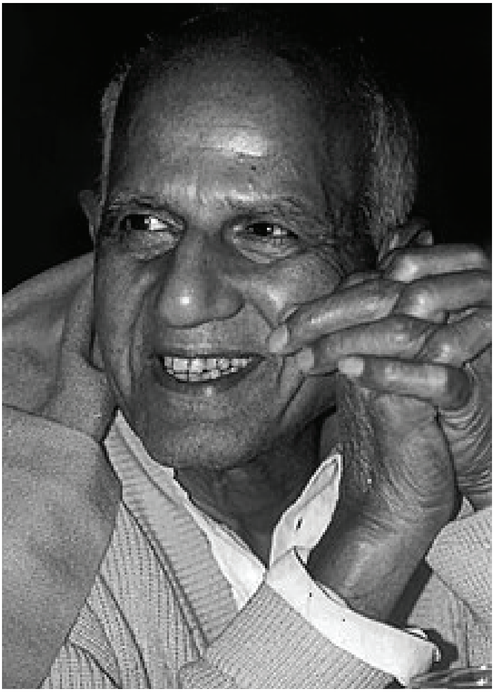

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা, দেশীয় জ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃত ধরমপাল

দুই উপনিবেশ বিরোধী তাত্ত্বিক চন্দ্র কান্ত রাজু, ক্লদ আলভারেজ

মানুষ কেবলই পুরাণ ও রামায়ণে মেতেছিল এই ধারণা থেকে বেরোতে হবে। কাঞ্চা ইলাইয়া যেভাবে মার্ক্সবাদকে কাজে লাগিয়েছেন এবং জাতির প্রশ্নটাকে উৎপাদন, প্রযুক্তি আর জ্ঞানকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে একটা অন্য ন্যারেটিভ দেবার চেষ্টা করেছেন, সেটা আমার বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

বিশ্বেন্দু - এটা নিয়ে চন্দ্রকান্ত রাজুর কাজ আছে, দক্ষিণে এসে জেসুঈটেরা কীভাবে ক্যালকুলাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আর ক্রেস্ট অব দ্য পিককের লেখক [সে সময় নামটা মনে পড়ে নি - জিভার্গিস যোসেফ] আর্যভট গোষ্ঠী তৈরি করে ২০০ বছর এগিয়ে থাকা ক্যালকুলাসের ইওরোপ গমনের বিষয়টা প্রমান করছেন - পরে দল ভেঙে যাচ্ছে রাজুর বৈপ্লবিক অবস্থানের জন্যে।

আদিত্য - ধর্মের যে একটা সর্বব্যাপী প্রভাব তৈরি হচ্ছে। এটা তৈরিতে ওরিয়েন্টালিস্টদের [ওরিয়েন্টালের চলতি বাংলা প্রাচ্য, কিন্তু সৌরভ রায় বলছেন হিন্দুআধিপত্যবাদ] যেমন অবদান আছে, তেমনি জাতীয়তাবাদী - আরএসএস বা সেকুলারিস্ট ন্যাশনালিস্ট জাতীয়তাবাদী, সবার অবদান আছে। প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই পূর্বের সমাজগুলি নিয়ে দুরকম ধারণা ছিল। হয় ওরা মনে করতেন এই সমাজগুলি পিছিয়েপড়া, অসভ্য বা বর্বর আর তা না হলে তাদেরকে বিচিত্র [এক্সটিক] এবং পশ্চিমের থেকে একদম আলাদা মনে করতেন। সব রকম জাতীয়তাবাদী মেনে নিচ্ছেন যে, পশ্চিম

হল মেটিরিয়ালিস্ট আর আমরা, প্রাচ্য গভীরভাবে ধর্মীয়। আমাদের কাজ হল ভাবা - আমরা বিশ্বের স্পিরিচুয়াল লিডার, বিশ্বকে স্পিরিচুয়ালিটি শেখাব। আমাদের এখানে এত কিছু ঘটনা ঘটছিল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে - ঐগুলো সব যেন লুপ্ত হয়েগেল আর রয়েগেল একমাত্র সত্য - আমরা না কী উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক - আর কিছু নয়।

বিশ্বেন্দু - নুরুল হাসান বলছেন সুলতানি আর মুঘল আমল শারিয়া দ্বারা শাসিত হয় নি, বরং জাহান্দারি, বাস্তবের নানান ঘটনাবলী সমাধান করার জন্যে উদ্ভুত নীতি থেকে পরিচালিত হয়েছে। আকবর বৈপ্লবিক স্ট্যান্ড নিচ্ছেন। আমার একটা কাজ আছে আওরঙ্গজেব ভ্রম নিরসন, সেখানে বলেছি আওরঙ্গজেবের ব্যাপারে বামপন্থী কংগ্রেস আর সঙ্ঘীরা একমত।

আদিত্য - আমাদের সমস্যা হল, আমরা যখন ইওরোপের কাঠামোর বাইরে বেরোতে চাই, অবশ্যম্ভাবী আমরা ধর্মের খপ্পরে পড়ি। হাতে গোণা মানুষদের মধ্যে ধর্মপাল এই রাস্তায় অনেক কাজ করেছেন।

বিশ্বেন্দু - আমার বৌদ্ধিক জগতে, পরম্পরা ছাড়া প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বড় কাজের ধাক্কা হল ধরমপালের চেঙ্গলপেট্টু রিপোর্ট বিষয়ে তাঁর আর যতীন্দ্র বাজাজের লেখা এবং ধরমালেরই 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি' বইটা। অনেক সময়ই রিগ্রেসিভ কথা বলেছেন, অনেক সময় ডেটেড মনে হয়, কিন্তু দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, ভারতবর্ষীয় সমাজ বুঝতে তাঁর অবদান আমি অন্তত অস্বীকার করতে পারব না। এবং মার্ক্সিস্ট ক্লদ আলভারেজই তাঁকে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ৫ খণ্ডের রচনাবলী আদার ইন্ডিয়া প্রেস থেকে প্রকাশ করে। তাঁদের একটা চেষ্টা ছিল সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ইতিহাস তুলে ধরা।

আপনি তো বললেন এক দিকে যেমন ইওরোপিয় কাঠামো চলবে না আবার সঙ্ঘী ধর্মীয় কাঠামোও চলবে না। তাই জনইতিহাস। তো জনইতিহাস বলতে আমরা কী বুঝি সেই উদাহরণ দিয়ে আমরা আজকের কথোপকথন শেষ করব। দিনাজপুরের একটা গ্রামের নাম হরিরামপুর। [আদিত্য স্পষ্টভাবে গ্রামনামটাই জানতে চাইলেন]। পাল আমলে পাল রাজা আর অদম্য কৈবর্ত সমাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কৈবর্তরা পাল রাজাদের ক্ষমতাচ্যুত করে। সেই যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক এলাকাটা মূলত আজকের দিনাজপুর জেলা। দিনাজপুরের হরিরামপুর কৈবর্তদের হেরে যাওয়া যুদ্ধের ইতিহাস

ধরে রেখেছে, যে যুদ্ধে কৈবর্তদের সেনাপতি হরিকে অর্থ দিয়ে বশ করেন রামপাল। এই রামপাল আর হরির নাম জুড়ে তৈরি হয়েছে দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লক। মালদহে আরও একটা জায়গার নাম মহেন্দ্র। এই সেই রাজা গণেশের পুত্র মহেন্দ্র দেব যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন বা যদু নাম গ্রহণ করেন। তাঁর নামে দিনাজপুরের মহেন্দ্র অঞ্চলে প্রায় দুশ বছরের পুরোনো বাইশার মেলা অনুষ্ঠিত হয় আজও। ইন্টারেস্টিং হল দক্ষিণবঙ্গ থেকে মালদা শহরে প্রবেশ করতে পড়ে আরেকটা জায়গা যার নাম যদুপুর। গণমানুষ এইভাবেই নিজেদের মত সাঁটে ইতিহাস ধরে রাখেন।

আমরা শুধু ইওরোপিয় কাঠামোর ইতিহাস রচনা বুঝি, কিন্তু উপনিবেশ বিনাশের দায় কাঁধে নিয়ে যারা মাঠে নেমেছেন, তাদের এই ইতিহাসের কাঠামো বোঝা, তাকে ডিকোড করে ইতিহাস লেখায় উদ্যমী হতে হবে - এই ডাক দিয়ে আজকের উপনিবেশবিরোধী চর্চার আলাপ শেষ করলাম। আপনি এই যে বার বার ডিকলোনাইজেশনের কথা বলছেন, এই রাস্তাই আমাদের সেই উপনিবেশনাশের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে দেবে। এই কাজের শর্টকাট নেই।

জ্ঞানগঞ্জ অত্রি সাজাহান এবং আরও অনেক যুবার সক্রিয়তায় জনগণের আর্থিক-বৌদ্ধিক সাহায্যে এই গবেষণার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে।

আদিত্য - এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনও গতি নেই। এই লড়াই দীর্ঘকালের, একটা ইলেকশনে জেতা হারা দিয়ে এই লড়াই শেষ হবে না। এটা চলতে থাকবে। আমাদের লেগে থাকতে হবে। শেষমেশ কাজ হল একটা নতুন ধরণের তাত্ত্বিক প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করা। আমি দেখছি এদের [যুবাদের] জেনারেশনে এই কাজটা বেশি করে ঘটছে। ওরা খোলা মনে এই ধরণের চিন্তাভাবনা করতে পারে। তাদের পুরোনো ব্যাগেজটা নেই।

বিশ্বেন্দু - জ্ঞানগঞ্জের বিশ্বেন্দু, অত্রি, সাজাহানের পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আপনার আগামী উপনিবেশ-বিনাশী কাজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

টিকা

অপারেশন সানশাইন

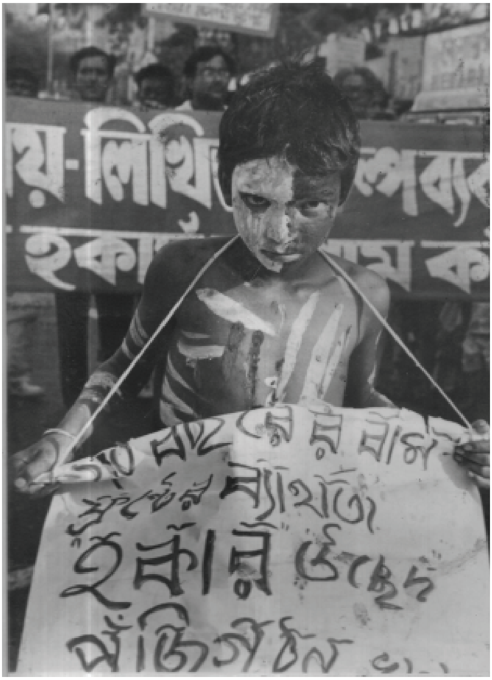

সালটা ছিল ১৯৯৬। খেটেখাওয়া মানুষদের নাম নিয়ে ক্ষমতায় আসা সিপিআইএম পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের গনগনে আমলে ২৪ নভেম্বর কনকনে শীতের রাতে এক মাস দোকান পাহারা দেওয়ার পরে, হকার উচ্ছেদ হবে না আশ্বাসে হাতিবাগানের ফুটপাথের হকারেরা ঘুমোতে গেছেন, সেই রাতে বিশাল বিশাল বুলডোজার, পে-লোডার নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মী, দলীয় ক্যাডার, পুলিশ উত্তর কলকাতার ফুটপাথে নেমে এল। মধ্যরাত্রে সূর্যোদয়ের নামে ভেঙে দেওয়া হল কয়েকশ হকারের জীবনজীবিকা, লুঠ করা হল তাদের স্টলে মালপত্র। অধিকাংশ দোকানের বয়স তিন দশকের বেশি, অনেকেই বঙ্গভাগের পর থেকে ফুটপাথকেই জীবিকা বেছে নিয়ে শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের অবলম্বন হয়ে উঠেছেন। এই উচ্ছেদের প্রতিবাদে শহরের হকার সঙ্গঠনগুলো এক জোট হয়ে হকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে প্রতিরোধে নামলেও, সরকারি পক্ষ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হকারদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। ১০০ জন হকারের জীবনের বিনিময়ে হকার উচ্ছেদ নীতি পরাস্ত হয়। হকারেরা ফুটপাথে টিকে যায়। আন্দোলনের সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে তৈরি হয় উচ্ছেদ বিরোধী যুক্ত মঞ্চ। কলকাতার অদম্য অনড় লড়াই বিস্তৃত হয়ে ২০১৩য় তৈরি হয় হকার বিষয়ক জাতীয় আইন। যে কোনও প্রতিরোধ আন্দোলনে দেশিয় উৎপাদকদের বাজার হকারেরা এবং বিপুল বড় সংগঠিত শক্তি।

সুভাষ চক্রবর্তী

জন্ম ১৮ মার্চ ১৯৪২, প্রয়াণ ৩ আগস্ট ২০০৯। সিপিআই(এম)-এ পার্টির গুরুত্বপূর্ণ জননেতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া, পরিবহন, এবং যুব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে আসা। ১৯৬২ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই), ১৯৬৪তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাথে যুক্ত হন। সুভাষ চক্রবর্তী সিআইটিইউর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। গত শতাব্দের নয়ের দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় কর্পোরেট ক্রীড়া ক্ষেত্র বানানোর হাতিয়ার অপারেশন সানশাইনকে বাস্তবে রূপায়িত করেন তিনি। মনমোহন সিংহের পরিকল্পনায় দেশজুড়ে রূপায়িত হওয়া কাঠামো পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা, স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি

পূর্বদেশে রূপায়ণ করার মুখড়া ছিল কলকাতার ফুটপাথে অপারেশন সানশাইন নামক উচ্ছেদ প্রকল্প। দল সুভাষ চক্রবর্তীকে মুখ্য ভূমিকা পালন করার নির্দেশ দেয়। শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি, শহরের গতিবৃদ্ধিরমত ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা রূপায়নে কলকাতা শিলিগুড়ির মত বড় শহরগুলো কর্পোরেট হাতে তুলে দিতে সিপিআইএম তাঁর মত জননেতার কাঁধে বন্দুক রাখে। টনি নেগ্রি যাকে নতুন যুগের ‘এম্পায়ার’ বলছেন আমেরিকা, জি৮, ন্যাটো, আইএমএফ, ডবলিউটিওরমত জাতিরাষ্ট্র, বহুজাতিক সঙ্গঠনের

কুলীনতন্ত্র সক্রিয়ভাবে বিশ্বায়ন, নিওলিবারেল নীতি প্রয়োগ করতে সর্বহারা রাজনীতি করা বাম দল সিপিএমকে বেছে নেয়। সিপিএম সুভাষ চক্রবর্তীর মত জননেতা ব্যবহার করে হকার উচ্ছেদ করে সক্রিয়ভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন বিশ্বায়ন প্রকল্পের ভিত তৈরি করে। তাঁর নেতৃত্বে অপারেশন সানশাইন বাস্তবায়িত করা ছিল খেটেখাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকায় বামফ্রন্টের প্রথম পরিকল্পিত আঘাত। এই উচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়ায় সিপিএম গ্রাম শহরের নিম্নআয়ের সমর্থক হারাল, ২০০০এ কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণ হারাল, ‘কৃষকের সন্তান কী কৃষক হবে’ প্রশ্ন তুলে কৃষকদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে শেকড় ছেঁড়া কর্পোরেট-দাস শহুরে ভদ্রবিত্ত দলে পরিণত হল।

হকার সংগ্রাম কমিটি

কলকাতায় হকার উচ্ছেদ বিরোধী প্রথম বড় আন্দোলন শিয়ালদহ ফ্লাইওভার তৈরির ফলে হকার উচ্ছেদে। ১৯৯৬র নভেম্বরে হকার উচ্ছেদ পরিকল্পনা অপারেশন সানশাইন। কলকাতায় হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সিপিএমএর শ্রম সংগঠন সিআইটিইউ প্রভাবিত হকার সংগঠন বাদ দিয়ে কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি হকার সংগঠন একযোগে মিলে গড়ে তোলে হকার সংগ্রাম কমিটি। হকার সংগ্রাম কমিটির লড়াই বহু উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। হকার সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনের ফলে সর্বভারতীয় স্তরে তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, ২৭টা রাজ্যের হকাদের একটি অপঞ্জীকৃত

হকার আন্দোলন মঞ্চ। হকারেরা নিজেদের জীবিকার সুরক্ষার আন্দোলন ছাড়াও বামফ্রন্ট অন্য নিম্নআয়ের পেশাদারদের কলকাতা থেকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করলে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তৈরি করেছে। হকার উচ্ছেদ পরিকল্পনা বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে তারা টালিনালা, বাগবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে খালপাড় বাসিন্দা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যবহার

করে। দক্ষিণ এশিয়ায় সফলভাবে উচ্ছেদ রুখে দেওয়া আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে হকার সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা।

বিনোদ মিশ্র

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সিপিআইএমএলএরর তৃতীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের মাটিতে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নেতৃত্ব বিনোদ মিশ্র। ১৯৯৪ সালে আইপিএফ-এর ব্রিগেডে তিনি দলের নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ১৯৯৮ সালের সিপিআইএমএল লিবারেশন দলের কংগ্রেস চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সিপিআইএমএল লিবারেশন

১৯৭৪ সালে সিপিআইএমএল পার্টি নতুন করে তৈরি হওয়ার মাধ্যমে সিপিআইএমএল লিবারেশন [আমরা শুধুই লিবারেশন ব্যবহার করব] পার্টি তৈরি হয়। চারু মজুমদারের পর পার্টির দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্পাদক হন সুব্রত দত্ত। তিনি ভোজপুর সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ ৭২ ঘণ্টা বন্দুক যুদ্ধে শহীদ হন। ১৯৯৮ সালে পার্টির নতুন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি একটানা লিবারেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তার সময়েই পার্টির সাংগঠনিক বৃদ্ধি ও নির্বাচনী ফল সর্বাধিক আকার নিয়েছে। ভারতের বুকে যখন অন্য বামপন্থী দল দুর্বল হচ্ছে, তখন লিবারেশনের ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি বাম আন্দোলনকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে। যদিও লিবারেশনের সারা ভারতে সাংগঠনিক অবস্থা সমান নয়। বিহার, ঝাড়খন্ড,অসমে লিবারেশন তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী।

অনুপম মিশ্র

কবি, গান্ধীবাদী, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ভবানীপ্রসাদ মিশ্রের পুত্র। দেশজ জ্ঞান, প্রযুক্তি চর্চার অন্যতম প্রধান পুরোধা। আজ ভি খাড়ে হৈ তালাব (পুকুর আজও বেঁচে আছে) লেখেন। ঐতিহ্যবাহী পুকুর আর জল ব্যবস্থাপনার আট বছরের মাঠ গবেষণার ফল। জল-সংরক্ষণ বুঝতে, পুকুরের প্রযুক্তি বুঝতে এই বই প্রাথমিক পাঠ্য। ব্রেইল সহ ১৯টি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১০০,০০০টিরও বেশি কপি বিক্রি হয়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এটা ইংরেজি সহ ১৩ ভাষায় প্রকাশ করে। এছাড়াও রাজস্থান কি রজত বুন্দে (রাজস্থান রূপোলী বৃষ্টি ফোঁটা) বইতে পশ্চিম রাজস্থানে জল সংগ্রহ এবং জল ব্যবস্থাপনার নথিভুক্ত করেছে। জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চির্চার মত তাঁর কোনও বইতেই কপিরাইট নেই। উৎসাহীরা তাঁর টেড বক্তৃতা দেখতে পারেন

https://www.ted.com/talks/anupam_mishra_the_ancient_ingenuity_of_water_harvesting

ধরমপাল

বাংলা তথা ভারতের গ্রামীনদের জ্ঞানচর্চা নিয়ে খুব কম কাজ হয়েছে। পশ্চিমি পদ্ধতিতে শিক্ষিত অধিকাংশই দেশিয় জ্ঞানচর্চায় অবিশ্বাসী। দেশিয় বামপন্থীরা বহুকালই এ পথ মাড়ান নি। উপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার বিরোধিতা এবং কারিগর চাষী

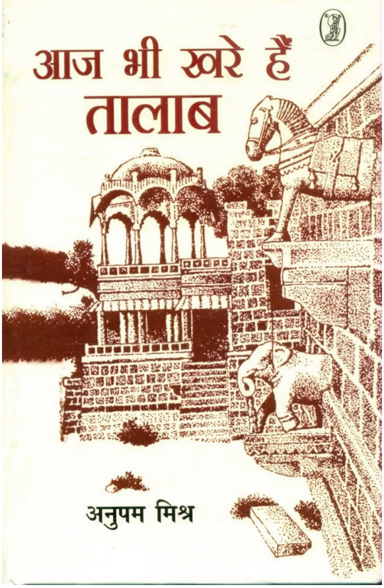

হকারদের জ্ঞানচর্চার পক্ষ নিচ্ছেন মূলত গান্ধীবাদী, কিছুটা সোসালিস্টরা। আজও ইওরোপের কেন্দ্রিভূত প্রযুক্তি, সম্পদ লুঠ[উতসা পট্টনায়েক, রিভিজিটিং ড্রেন থিওরি...তে বলছেন, আইসিএস রমেশচন্দ্র দত্তের হিসেবে যে ৬২০ মিলিয়ন পাউন্ড উপনিবেশিক লুঠের গননা করেছেন, তাতে যদি মাত্র সরল ৫ শতাংশ সুদ প্রয়োগ করা যায়, তার পরিমাণ হবে ২০১৬র ভারতের জিডিপির ২/৩ অংশ, ২০১৫র যুক্তরাষ্ট্রের জডিপির ৪৫ শতাংশ। আর মন্টগোমারি মার্টিনের নিদানে ১২ শতাংশ সুদ লাগালে সে পরিমাণ হয় £11,930.54 trillion, ২০১৫র ব্রিটিশ জিডিপির ৬০০০গুণ], তার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুললেই বামপন্থীরা অস্বস্তিতে পড়েন। উপনিবেশিক লুঠ নিয়ে বিগত আড়াই দশক বামপন্থীরা বিশেষ করে অমিয় বাগচী, উতসা পট্টনায়েক কাজ করেছেন।

দেশজ জ্ঞানচর্চা নথিকরণ কাজকে বাস্তবায়িত করার প্রধান এবং প্রথম যুগের অন্যতম সফল ঘটক ধরমপাল। তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে ব্রিটিশদের নথিকৃত দেশিয় জ্ঞানচর্চাগুলোর নিদর্শন সংকলিত করেন। চাষী কারিগরদের কৃতিকে কম্বুকণ্ঠে প্রকাশ করার কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেন। তার পাঁচখণ্ডের রচনাবলী প্রকাশ করেছে গোয়ার কর্পোরেট লুঠ বিরোধী আন্দোলনের নেতা মার্ক্সবাদী ক্লদ আলভারেজের নেতৃত্বে আদার ইন্ডিয়া প্রেস। নেট সংস্করণ পাওয়া যায়। উপনিবেশপূর্ব সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিউটিফুল ট্রি আর শেকড়ের জ্ঞানচর্চা বিষয়ে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি অবশ্য পাঠ্য। আজ যারা উপনিবেশ বিরোধী জ্ঞানচর্চা নিয়ে কাজ করছেন তারা প্রায় সকলেই তাঁর ভাবশিষ্য।

ক্লদ আলভারেজ

ক্লদ আলফোনসো আলভারেজ গোয়ার কর্পোরেট বিরোধী লুঠ আন্দোলনের নেতা। আলভারেজ আদার ইন্ডিয়া প্রেসের সম্পাদক। ১৯৮৬র পরিবেশ সুরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে গোয়ায় সমমনা জনগণকে একত্র করেন। আলভারেজ এই বছরেই সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে, নতুন পরিবেশ আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গোয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। আলভারেজ জিন প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি ফসলের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন। ১৯৮৬তে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় 'দ্য গ্রেট জিন রববারি' মার্কিন-বিনিয়োগে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের দেশীয় ফসলের জাতগুলিকে নিজস্ব কম-মজবুত জাত দিয়ে প্রতিস্থাপনের দিকনির্দেশী সমালোচনা করেন। সে বছর একই পত্রিকায় এইচ আর রিচারিয়ার 'পদদলিত, কিন্তু হারি নি' শীর্ষক সাক্ষাৎকার নেন ক্লদই। আজকের জৈব কৃষির আব্বা, সেদিনের কর্পোরেট, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল স্বামীনাথনের চক্রান্তে লাঞ্ছিত প্রয়াত আর

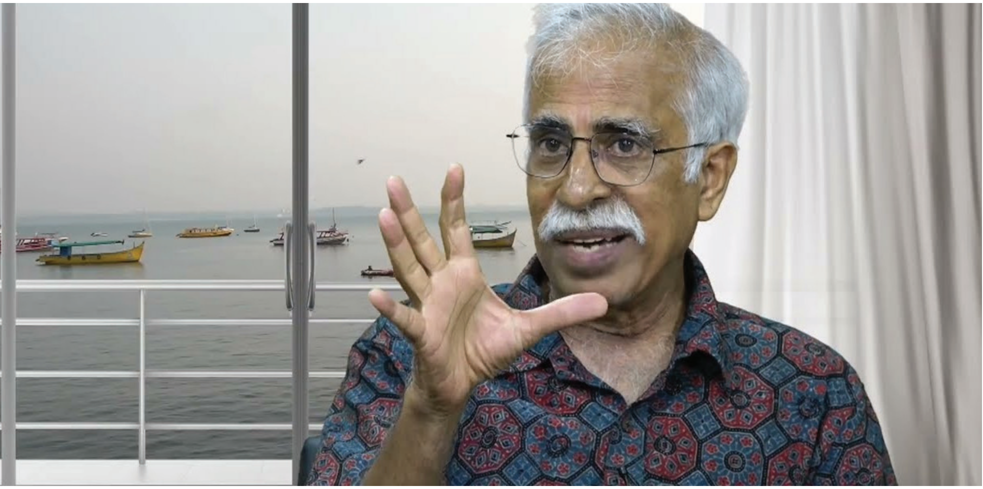

এইচ রিচারিয়া ছিলেন দেশের অন্যতম প্রধান কৃষি, ধান বিশেষজ্ঞ। দেবল দেব আর অনুপম পাল যে বৈপ্লবিক কর্ম করছেন, সেই কাজ রিচারিয়া শুরু করেছিলেন পাঁচের দশক থেকে। তখন ভারতীয় কৃষিতে ফোর্ড, রকফেলার ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন আন্তির্জাতিক দাতা এবং বহুপাক্ষিক সংগঠনের সহায়তায় ভারত সরকার দেশজ কৃষির বৈচিত্রময় বনিয়াদ ধ্বংস করে নিয়ে আসছে বহুজাতিকদের উৎপাদন তত্ত্ব অনুসারী বৈচিত্রহীন লাভজনক অর্থকরী কৃষিকর্ম। মাথায় রাখা দরকার ড রিচারিয়ার সংগ্রহ করা ১৯০০০ দেশীয় বীজ ছত্তিশগড়ের ইন্দিরাগান্ধী এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির হাতে ছিল। সঙ্গে জুড়েছিল আরও ৫০০০টি প্রজাতি। ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ

২৪০০০টি বহুজাতিক কৃষি সংস্থা সিনজেন্টাকে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার' জন্য তুলে দেওয়ার চুক্তি করে। কোম্পানিটি সেই বীজগুলিকে জিন পরিবর্তন করে বাজারে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই খবর স্থানীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় চুক্তিটি আটকে যায় তিনি বেগুনের মতো সবজির জেনেটিক্যালি-পরিবর্তিত সংস্করণ বাজারজাত করার মনসান্টোর প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করেন। ক্লদ ধরমপালজীর ব্যতিক্রমী বামপন্থী শিষ্য - উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মী-উদ্যোক্তা। ক্লদের কয়েকটা বই Science, Development and Violence: The Revolt Against Modernity বা Decolonizing History: Technology and Culture in India, China and the West 1492 to the Present Day, Science, development, and violence; Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures: A Springer Live Reference, Damming the Narmada, A Farewell to the Eurocentric Imagination, Goa, Sweet Land of Mine।

চন্দ্রকান্ত রাজু

চন্দ্র কান্ত রাজু যেহেতু আইআইটি প্রশিক্ষিত। একই সঙ্গে দেশিয় জ্ঞানচর্চা আন্দোলনের অন্যতম সেরা মুখ তাই তাঁর কাজ, বক্তব্যকে হুট করে বাদ দেওয়া, মনগড়া বলা মুশকিল। তাই রাজুর বেশ কিছু বই আছে, তার নিজের ওয়েবসাইট আছে, ব্লগ আছে নেটে প্রচুর পিডিফ আছে, প্রচুর বক্তৃতা আছে, পড়ে/দেখে নেওয়া দরকার http://ckraju.net/। রাজু যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণাও করেছেন, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং দাবি দক্ষিণ ভারতবর্ষ থেকে ইওরোপে ক্যালকুলাস গিয়েছে লিবনিতজ আর নিউটনের আমলে সেই অঙ্কটা ছিল ইওরোপের থেকে ২০০ বছর এগিয়ে। রাজুর দাবি যে বিজ্ঞানের পশ্চিমা দর্শন, তার দিকগুলি সহ যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং গাণিতিক প্রমাণের প্রকৃতি রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মতান্ত্রিক চাহিদার মধ্যে নিহিত।

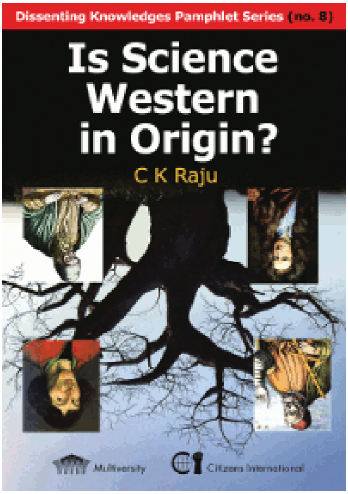

ভারতীয় ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরব্য রজনী সিরিজ। ছবিতে খাদ্য পরিবেশন করছে এক ভারতীয় চরিত্র। ফরাসি আঁকিয়ের দ্বারকানাথের স্থির চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হতে পারে যেন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম কর্পোরেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজেই খানসামা সেজে বেলগাছিয়া ভিলার ভোজসভায় মিস ইডেনকে খাদ্য পরিবেশন করছেন।

ভারতীয় ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য

আদিত্য নিগম

ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনে ছাত্র-যুব বক্তৃতা

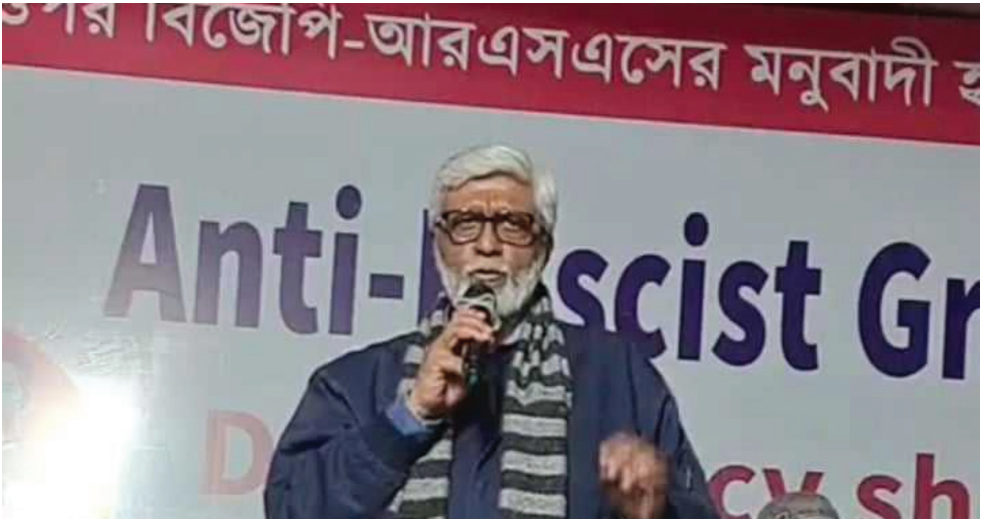

আমি বক্তৃতায় দু'তিনটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। চেষ্টা করব যাতে অল্প সময়ের মধ্যে আমার কথা শেষ করতে পারি। বর্তমান সময়ে ফ্যাসিজম বলতে আমরা যা বুঝি সে বিষয়ে অনেক কথা আজ সকাল থেকে বক্তারা বলেছেন। আমি সে সব কথা

নতুন করে বলতে চাই না। মূল আলোচনা করব ভারতীয় ফ্যাসিজমের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ফ্যাসিজম বললেই আমরা খুব সহজে চলে যাই ইওরোপের উদাহরণে - আমাদের সামনে চলে আসে হিটলার মুসোলিনি পুঁজিবাদের ছবি। মাথায় রাখতে হবে বিশ্বের প্রত্যেকটা অঞ্চলে ফ্যাসিবাদের চরিত্র এক নয়। যেমন প্রত্যেকটা জায়গায় ফলিত মার্ক্সবাদের চরিত্র এক নয় - মাও যে বিপ্লব চিনে করলেন বা ভিয়েতনাম যে বিপ্লব করল, তার চরিত্রের সঙ্গে রুশ বিপ্লবের চরিত্রের মিল নেই। ভুগোল আলাদা, জনগণ আলাদা, বিপ্লবের বক্তব্যও আলাদা। সেই দৃষ্টিতে দেখলে [বিশ্বজোড়া] ফ্যাসিজমেরও একটা চেহারা নয়। সেই যুক্তিতে ভারতবর্ষে যে ধরনের ফ্যাসিজম দেখছি, তাকে দুটো দিক থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করব।

হিন্দু মহাসভা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তৈরি হয়েছিল ১৯২০র দশকের মাঝের দিকে। তারা ইতালি আর জার্মানির ঘটনাক্রম থেকে প্রেরণা পেয়েছে এবং ফ্যাসিস্ট তাত্ত্বিকতা সঙ্ঘ তৈরির কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু যদি আমাদের বিশ্লেষণ সেখানেই থমকে যায়, তাহলে মারাত্মক ভুল করব। হিন্দুত্ব বলে যে ব্যাপারটি আমাদের দেশে পাকিয়ে উঠেছে, যে হিন্দুত্বের কথা সাভারকর ‘এসেন্স অব হিন্দুত্ব’ বইতে লিখলেন, সেই বইতে তিনি যে সব কথা বলেছেন, সেটা আমরা অনেকেই জানি, আজ আর পুনরাবৃত্তি করে ফেনিয়ে তোলার মানে নেই। কিন্তু সেই বইতে আলোচ্য আলাপের লম্বা পটভূমি আছে। পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুত্ব শব্দটা প্রথম উচ্চারণ করেন। এই শব্দের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র [চট্টোপাধ্যায়] আনন্দমঠে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবনা করলেন - আমি বলছি না, বঙ্কিমচন্দ্র আজকের হিন্দুত্বের জনক, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে উনিশ শতক থেকে এক ধরণের উথালপাথাল চলছিল, আমাদের ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে, সমাজে, রাজ্যে - তখন রাজ্যের ধারণা ছিল না - অঞ্চলগুলোয় এক ধরণের আলাপ আলোচনা চলছিল, যার মধ্যে থেকে এই ধরণের ভাবনাচিন্তা বেরিয়ে আসছিল। এই কথাটা বললাম তার কারন হল, এই ধরনের আলাপ আলোচনায় সমাজের মানিসিকতায় কী ধরনের উথালপাথাল চলছিল সেটা বোঝা যায়। আমাদের বোঝা দরকার সমাজের কোন কোন রসদ থেকে ফ্যাসিস্টরা কী কী উপাদান সংগ্রহ করছে। তারা শুধু যদি হিটলার মুসোলিনি থেকে ভাবনাচিন্তা গ্রহণ করত, তাহলে তাদের বিরোধিতা করার ব্যাপার অনেকটাই সহজ হয়ে যেত। সেটা তো হয়েইছে, কিন্তু তার থেকেও তারা অনেকটা দূরে এগিয়েছে। ফ্যাসিজমের একটা চরিত্র হল, সে ইওরোপিয় ফ্যাসিজমই হোক, বা অন্যত্রের ফ্যাসিজমই হোক - সে দানা বাঁধার আগে প্রত্যেকটা গণআন্দোলন বামপন্থীদের নেতৃত্বে হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম বামপন্থীদের সামনে ফ্যাসিস্টরা এমন একটা গণআন্দোলন তৈরি করল, যার [অভিমুখ] বামপন্থীরা ধরতে পারল না, কিন্তু তারা ভাবল জনগণ তখনও তাদের

সঙ্গে আছে। এবং এটাই ইতিহাসে লেখা আছে। মাথায় রাখতে হবে ইতিহাসে কিছুই লেখা নেই। ইতিহাসকে আমরা যেভাবে বুঝতে চেষ্টা করি সেটা ঠিক পদ্ধতি নয়, এবং সেটা মার্ক্সবাদকে ভুল বোঝার রাস্তাও বটে কারন ইতিহাসের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। জনগণ যে সব সময় বামপন্থীদের সঙ্গেই থাকবে, এটাও ঠিক নয় - সেটা অন্তত ইতিহাস প্রমান করেছে বারে বারে। হিটলার কিন্তু নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল। আর তার থেকে বড় কথা হল এই যে, কমিউনিস্টদের আবির্ভাবে যেমন পুঁজিপতিরা বিপদ দেখেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন যে, এরা আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেবে। তাই ফ্যাসিজম পেরেছে জাতীয়তাবাদের নামে তাদের বিভ্রান্ত করে দলে টানতে।

আমি এবার ভারতীয় ফ্যাসিজিমের প্রশ্নে আসি। এর আগের বক্তাদের আলোচনার সময় ভাবছিলাম, তারা বারবার বলছিলেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে। রাম পুনিয়ানি স্যর বলছিলেন এবং অন্যান্যরাও বললেন ডিভাইড এন্ড রুল ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলনের সময় সাম্রাজ্যবাদীরা প্রয়োগ করেছে। এটা তাদের নীতিও ছিল। এখানে আমরা যে জায়গায় ভুল করি সেটা হল, আমরা দেখি না সে সময় সমাজের গভীরে যে ধরণের চার্নিং [উথালপাথাল] চলছিল তার সঙ্গে আমাদের সংযোগ কোথায় যেন কেটে গেছে। আমরা যে সব কথা বলি সে সব সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটে না। আমরা সমাজের সেই চার্নিংএর জায়গাটা ধরতে পারছি না। আমরা যখন বলছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ডিভাইড এন্ড রুল চালাচ্ছিল, তখন কী আমরা জানি কয়েক বছর আগে ভীমা-কোরেগাঁও নিয়ে খুব বড় জমায়েত হল, সেই জমায়েতে যোগ দেওয়া বহু মানুষকে সরকার বহু সাজানো মামলায় জড়িয়েছে। সেই ভীমা-কোরেগাঁও লড়াইএর ইতিহাসটা কী? ১৮১৮য় মহারাষ্ট্রে মাহার রেজিমেন্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লড়ে পেশোয়াদের রাজত্ব উচ্ছেদ করে। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর ক্ষমতা বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ঘটনাকে ডক্টর আম্বেদকর সমর্থন করেছেন, এবং আজও এই ঘটনার পক্ষে বহু মানুষ দাঁড়িয়েছেন। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ভীমা কোরেগাঁওতে যোগ দেন। সেদিনটা উৎসব হিসেবে দেখা হয়। পেরিয়ার, আম্বেদকর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্যে অথবা তার উপস্থিতির সাহায্য নিয়ে বহু আন্দোলনকে ব্যবহার করেছেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে দরকষাকষি করতে। তাদের যুক্তি ছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে আবার দলিতদের যাতে পেশোয়াদের দাসত্ব না করতে হয়, তার জন্যে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্য নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতার সঙ্গে একটা হিসেব নিকেশ করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের গঠনের পিছনে যে এংজাইটি ছিল, তার একটা হল দলিত আন্দোলন গড়ে উঠতে চাওয়া। যে সব

দলিত বহুজন ব্রিটিশদের সাহায্যে পেশোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বিজয়ী হয়েছে, তারা ব্রিটিশ এজেন্ট নয়, নিজেদের সমাজের মুক্তির পথ খুঁজছেমাত্র।

উনিশ শতক থেকে উচ্চবর্ণের বুদ্ধজীবিরা, চিন্তকেরা হিন্দু ঐক্যের জন্যে একটা টার্গেট নিল। সাভারকর ১৮৫৭র লড়াই নিয়ে বইতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা লিখেছেন। কিন্তু উনি একসময় বুঝতে পারলেন যতক্ষণ না তিনি নির্দিষ্ট শত্রু চিহ্নিত করতে পারছেন, ততক্ষণ সার্বিক হিন্দু সংহতি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। তখন থেকে তিনি বললেন হিন্দু সংহতি তৈরি করার একমাত্র এজেন্ডা মুসলমান বিরোধিতা তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পথ। আমরা যেন ভুলে না যাই হিন্দু-মুসলমান সংহতি আদতে হিন্দু সমাজের মধ্যেকার চাহিদার প্রতিফলন। ঠিক এই জন্যে সঙ্ঘীরা জাতীয় [মুক্তি] আন্দোলন থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল।

এইবারে আমি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি। উপনিবেশবাদের সঙ্গে হিন্দুত্বের সম্পর্ক বোঝার দরকার আছে। হিন্দুত্ববাদীরা এমন একটা ভাব করে ওরা যেন উপনিবেশের বিরোধী। উপনিবেশবাদ বিরোধিতার নাম করে, ডিকলোনাইজেশনের দোহাই দিয়ে বহু নতুন [দমন-পীড়নের] আইন আনছে। মনে রাখতে হবে হিন্দুত্বের রাজনীতির মূলে কিন্তু কলোনি, উপনিবেশ। এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে সমস্যা। দুটো জিনিস পরিষ্কার করে বলা দরকার। প্রথমটা হল ওরা যখন হিন্দু নলেজ সিস্টেমের কথা বলে, তখন মাথায় রাখতে হবে তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কথা বলছে, ব্রাহ্মণ্য ফলোজফির পৃষ্ঠপোষণা করছে। আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে যেমন চার্বাক দর্শন আছে, শাক্ত পরম্পরা আছে, গোহত্যা আছে, বহু আচার আচরণ আছে যা বৈদিকও নয়, ব্রাহ্মণ্যও নয়। ভারতীয়ত্বের নাম করে যত সব কিছু, সব কিছুকেই সঙ্ঘী জাতীয়তাবাদীদের ব্যবহারের জন্যে তুলে দেওয়া ঠিক হবে কী না আমাদের ভাবতে হবে। ভারতীয় যা কিছু সব কিছু সঙ্ঘীদের রাজনীতি করার জন্যে ছেড়ে দিলাম, আমরা রয়েগেলাম লেনিন-স্ট্যালিন নিয়ে রাজনীতি করার জন্যে, এটা রাজনীতি করার ঠিক পদ্ধতি কীনা ভাবতে হবে এবং আমরা এই রাজনীতি সম্বল করে কতদূর এগোতে পারব, আমার সন্দেহ আছে।

আমার আরেকটা বক্তব্য হল বিজ্ঞান আর স্পিরিচুয়ালিটির দ্বন্দ্ব। উপনিবেশের সময় মিথ চালু হয়েছিল স্পিরিচুয়াল ভারতবর্ষ আর বস্তুজাগতিক পশ্চিম, ইওরোপ। এই মিথ হিন্দুত্ব রাজনীতির প্রণেতারা আয়ত্ত্ব করে, হজম করে রোজ আমাদের সামনে উগরে দিচ্ছে। সঙ্ঘীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বললেও তারা অনেক বেশি জোর দেয় স্পিরিচুয়ালিটিতে - আসলে তারা প্রচার করতে থাকেন যে সব কিছু আধ্যাত্মিক,

এমন কী বিজ্ঞানও বেদও, বৈদিক কাল থেকে চলে আসছে। এই সব অদ্ভুত ধারণাগুলো আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে অনেকবার শুনেছি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সায়েন্স এন্ড টেকনলজি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' বইটা পড়লে আপনি বুঝে যাবেন উপনিবেশপূর্ব সময়ের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ম্যাপিংটা। স্পিরিচুয়ালিটি ছাড়াও এদেশের সাধারণ মানুষ অনেক কিছু করেছেন... সায়েন্স হোক, জ্যোতির্বিদ্যা হোক, স্থাপত্য বিদ্যাই হোক, এ সব সায়েন্স ছাড়া হতে পারে না। মাথায় রাখতে হবে স্পিরিচুয়ালিটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার একটেরেপনাই আসলে হিন্দুত্বের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে।

আরেকটা কথা বলে আজকের বক্তৃতা আমি শেষ করব। মাথায় রাখতে হবে সাভারকরের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক বেশ জটিল। কারন সাভারকর ছিলেন নাস্তিক - উনি যা করেছেন পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল - ধর্মকে তিনি কেবল ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারে সঙ্ঘের চরিত্র একই। কিন্তু সংঘ যেহেতু একটা বৃহত্তর হিন্দু সংহতি গড়ার কাজে লিপ্ত, তারা বোঝেন যে আসলে হিন্দু বলতে কিছু নেই - হাজারটা জাতি সম্প্রদায় আছে। যাদেরকে একজায়গায় নিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি এক-দেড় হাজার বছরের পিছনের ইতিহাসটা দেখি, তাহলে দেখব পুরাণের যুগ শুরু হওয়ার সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য থাকবন্দীর বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য যে মাইথোলজি তৈরি হয়েছে, সেটা বিভিন্ন পুরাণে আলাদা আলাদা রকমের। সবার রূপ এক নয়। সামনে থাকা মানুষের চরিত্র নির্ভর করে কিন্তু সঙ্ঘীরা আলাদা আলাদাভাবে আলাপআলোচনা তৈরি করে। তাদের এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মাথায় রাখবেন এরা সব কিছু ছাড়তে রাজি হলেও কয়েকটা বিষয়ে এরা কম্প্রোমাইজ করে না যেমন ১) বেদের প্রাধান্য; ২) ব্রাহ্মণ্য থাকবন্দী; ৩) বর্ণাশ্রম ইত্যাদি আরও দুতিনটে বিষয়। বাকি সব বিষয়ে এরা নিজেদের পাল্টাতে প্রস্তুত, এই তত্ত্বটা মাথায় না রাখলে ভুল হবে। হিন্দুত্বের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে - একটু আগে রাম পুনিয়ানি এই বিষয় কথা বলছিলেন, যদিও আমার মত এখানে অন্যরকম। আমরা এই ফ্লেক্সিবিলিটিকে যেমন হিপোক্রাসিও বলতে পারি তেমনি এই ফ্লেক্সিবিলিটিকে যদি আমরা হিন্দুত্ব রাজনীতির অক্ষহৃদয় বলি তাহলেও ভুল হবে না। তাদের রাজনীতিতে দেখবেন, কেরলে গরুর মাংস খাওয়ায় যেমন তাদের সমস্যা নেই তেমনি উত্তরপুর্বে শুয়োর আর গরুর মাংস খাওতেও সমস্যা হয় না, তেমনি আর্যাবর্ত, অর্থাৎ উত্তর ভারতে গায় হামারি মাতা হৈ রাজনীতিও হিন্দুত্ববাদীদের রাজনীতির কেন্দ্রে চলে আসে। প্রত্যেকটা জায়গার জন্যে তারা আলাদা আলাদা রাজনীতির পথ তৈরি করেছে। সঙ্ঘের আদিবাসী রাজনীতির কথাই ভাবুন, উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের আর মধ্যভারতের ছত্তিশগড়ের আদিবাসী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা,

ওপরের তিনটে চরিত্র ছাড়া কোনও মিল নেই। কিন্তু একটা জায়গায় এদের বক্তব্য এক সেটা হল খ্রিস্টানিটির জন্যে হিন্দুত্ব খতরে মেঁ। সঙ্ঘের এই যে ফ্লেক্সিবিলিটির জন্যে তারা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য থাকবন্দী আর জাত ব্যবস্থা রেখেই তারা চরম ফ্লেক্সিবিল রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটাও মাথায় রাখা দরকার। ব্রাহ্মণ্য হেজিমনি বজায় রেখেই দলিতদের মাথা ঝুঁকিয়ে হিন্দুত্ব ফোল্ডে নিয়ে আসার রণনীতি সঙ্ঘ সফলভাবে প্রয়োগ করেছে। সেই প্রক্রিয়াটা রাজনীতি করা সঙ্গঠনের মাথায় রাখা দরকার। আমরা যখন হিন্দুত্ববাদের পাল্টা রাজনীতি করব, তখন তারা যে এলাকায় যে আকার ধরে রাজনীতি করছে, সেই ফর্মটা বুঝে আমাদের পাল্টা স্ট্রেটেজি নিতে হবে। একটা লাইন নিয়ে তাদের বিরোধিতা করতে গেলে সমস্যার হবে।

আজকে বিভিন্ন বক্তা যে সব কথা বলেছেন, সে সব খুবই জরুরি, সে সব কাজ আমাদের করতে হবে, তেমনি ফুলে-পেরিয়ার-আম্বেদকর যে বলছেন হিন্দু ধর্ম আমাদের দলিত বহুজনের মুক্তির পথ নয়, এই কথাও আমাদের বলতে হবে। পেরিয়ার বা আম্বেদকর বার বার বলেছেন সার্বিকভাবে হিন্দুধর্ম বলে কিছুই নেই।

আমি শেষ করব এই কথা বলে আজকে যে হিন্দুত্ববাদ দেখছি, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি শুরু হয়েছিল সেটা ছিল পরম্পরা আবিষ্কারের একটা রূপ, আজকেও এক ধরণের নতুন পরম্পরা আবিষ্কারের রাজনীতি শুরু হয়েছে। মাথায় রাখতে হবে লড়াইটা ইতিহাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে হচ্ছে না, মিথের রাজনীতির ওপর দাঁড়িয়ে হচ্ছে - মহিষাসুর থেকে শুরু করে বহু মিথ নতুন করে উপস্থিত হচ্ছে, প্রত্যেকটা মিথকে নতুন ব্যাখ্যায় উপস্থিত করা হচ্ছে। এই ব্যাখ্যাগুলো ঐতিহাসিকভাবে ঠিক কী ভুল, সেটা মূল প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল পাল্টা একটা কল্পনা সামনে রাখা হচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় পরম্পরা কী, হিন্দু ট্রাডিশনটাই বা কী, তার পাল্টা ইমাজিনেশন আমাদের তৈরি করার দরকার আছে তার জন্যে আমরা কী তৈরি? এবং আমাদের আগামী দিনে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে যদি সেই ইমাজিনেশন তৈরি করার দরকার হয়, তাহলে কাদের সঙ্গে আমাদের কোন ধরণের কোলাবরেশন করা দরকার সেটাও ঠিক করতে হবে।

আদিত্য নিগম রিডার

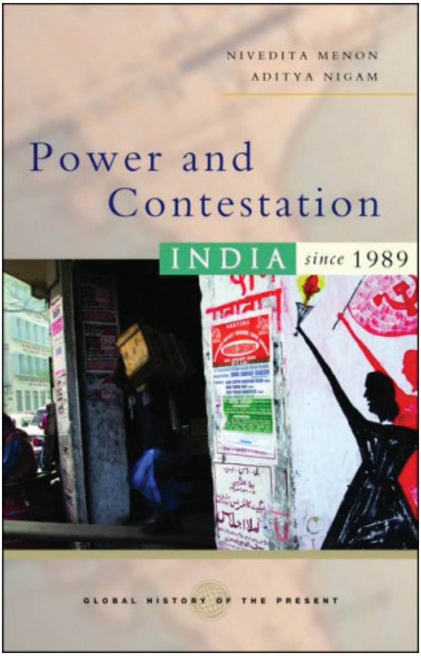
NIVEDITA MENON
ADITYA NIGAM
Power and Contestation
INDIA since 1989
GLOBAL HISTORY OF THE PRESENT

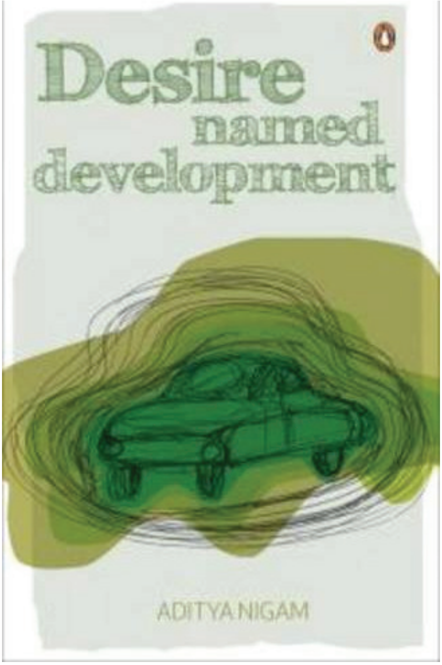
Desire named development
ADITYA NIGAM

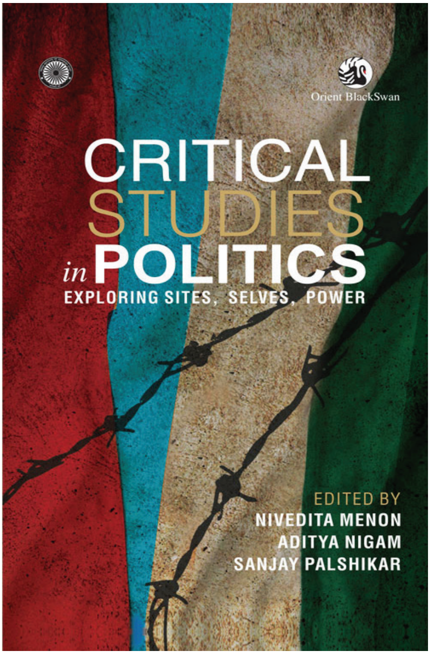
Orient BlackSwan
CRITICAL STUDIES in POLITICS
EXPLORING SITES, SELVES, POWER
EDITED BY
NIVEDITA MENON
ADITYA NIGAM
SANJAY PALSHIKAR

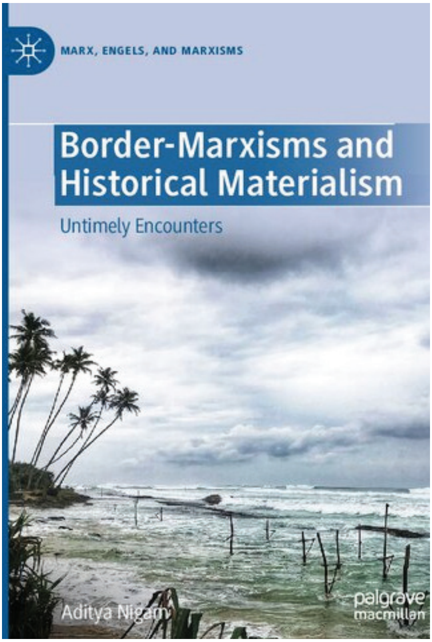
MARX, ENGELS, AND MARXISMS
Border-Marxisms and Historical Materialism
Untimely Encounters
Aditya Nigam
palgrave macmillan

আদিত্য নিগম রিডার

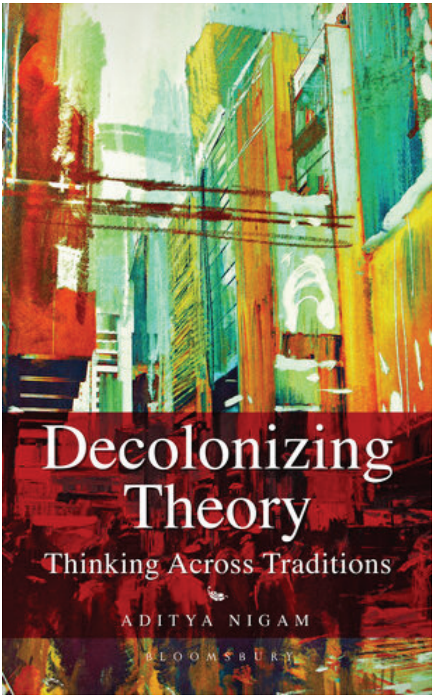
Decolonizing Theory
Thinking Across Traditions
ADITYA NIGAM
BLOOMSBURY

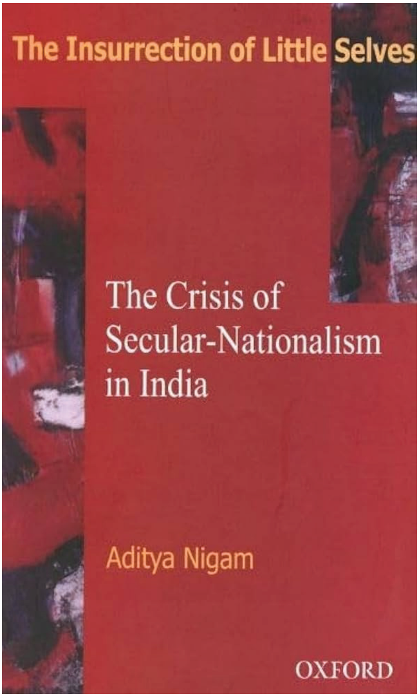
The Insurrection of Little Selves
The Crisis of Secular-Nationalism in India
Aditya Nigam
OXFORD

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং সাজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অবিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস

গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী

বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা

গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা

কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।

সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি

প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা

এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।

ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তত ৩টে প্রকল্প সমীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোর সামাজিক গুরুত্ব এবং সমস্যা

অন্তত ৮ মাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটে প্রকল্প ১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ২। কন্যাশ্রী ৩। সবুজসাথী নিয়ে রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা মধ্য বাংলা আর তরাই বাংলায় বিস্তৃত সমীক্ষা।

কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আশাকরি আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে শুরু করতে পারব।

১০। গ্রন্থাগার প্রকল্প

৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে

জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 40262011000228, IFSC - bkid 0004026